Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান রূপা

রোলঃ 23090120244

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান রূপা

রোলঃ 23090120244

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত জাহান রূপা, আইডিঃ 23090120244 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

নুসরাত জাহান রূপা

আইডিঃ 23090120244

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

গীবতের প্রাথমিক ধারণা..6
গীবতের পরিচয় বা অর্থ..7
গীবতের নানাবিধ উৎস বা মাধ্যমসমূহ :..16
গীবতের প্রকারভেদ..23
গীবতের ধরনসমূহ..27
গীবতে লিপ্ত হওয়ার মূল প্ররোচনা বা কারণসমূহ :..40
গীবত ও চোগলখোরি কী এক?..43
গীবত থেকে বাঁচবো কী করে..45
গীবতের বৈধ পন্থাসমূহ..46
এক- কারো প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে গীবত বৈধ..47
দুই- দোষ বা পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা যাবে..49
গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে কী পার্থক্য আছে?..60
গীবতের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ..62
গীবতের শাস্তি ও ভয়াবহতা..63
গীবতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়..68

কিছু কথা

اَللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

আলহামদুলিল্লাহ,

ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আল্লাহ তাআলা আমার মত এ নগণ্য বন্দীকে **"গীবত"**এর মতো ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ টপিকটার উপরে সামান্য মেহনত করার তৌফিক দিয়েছেন।

সেই সাথে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

এই থিসিসের মাধ্যমে আমি চেষ্টা করেছি গীবতের প্রকারভেদ, মাধ্যম, বৈধতা, প্রতিকার এবং তাওবার বিষয়গুলো বিশদভাবে উপস্থাপন করতে।

গীবত কেবল যে একটি সামাজিক ব্যাধি নয়; বরং একটি মারাত্মক ও ভয়ংকর গুনাহ যা আমাদের আত্মার নৈতিকতা, সম্পর্কের মর্যাদা এবং সমাজের শান্তির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

গীবতের প্রাথমিক ধারণা

মানুষের জবান আল্লাহর একটি অমূল্য নিয়ামত, যা দিয়ে মানুষ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কল্যাণ ছড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু একই জবান আবার এমন এক অস্ত্র, যা দিয়ে সে অন্যের সম্মান, মর্যাদা ও সম্পর্ক ধ্বংস করে ফেলতে পারে। মানবসমাজে গীবত বা পরনিন্দা সেই ভয়াবহ ব্যাধি, যা অদৃশ্যভাবে হৃদয়কে কলুষিত করে, সমাজের ঐক্য নষ্ট করে এবং আখিরাতের মুক্তিকে বিপন্ন করে তোলে।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

কোরআন মজিদেও গীবত সম্পর্কে কঠোর শব্দ এসেছে। সম্ভবত এরূপ কোনো শব্দ অন্য কোনো গুনাহ সম্পর্কে উচ্চারিত হয় নি।

কোরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

‘তোমরা একে অপরের গীবত বা পরনিন্দা করো না। (কারণ একটি জঘন্য পাপ। আপন ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতোই জঘন্য গুনাহ।) তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? (নিশ্চয় তা পছন্দ করেনা; বরং ভাববে এত বিকৃত কথা!) সুতরাং তোমরা গীবতকেও ঘৃণা করো।’
(সূরা আল- হুজুরাত,আয়াত:১২)

মানুষ যাতে গীবতকে ঘৃণা করে এবং তাতে যেন নিরুৎসাহিত হয় সেজন্য আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি প্রত্যাদেশ করেছেন। আয়াতটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে ভাবলেই বোঝা যায় যে গীবত কীরকম জঘন্য ও কুৎসিত কাজ।

গীবতের পরিচয় বা অর্থ

“গীবত” (غيبة) শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ “غابَ – يغيبُ” (গাবা – ইয়াগীবু) থেকে, যার অর্থ “অদৃশ্য হওয়া” বা “অনুপস্থিত থাকা”।

এর অর্থ বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করেছেন। তবে তাতে শুধু শাব্দিক পার্থক্য দেখা যায় মৌলিক কোন ভিন্নতা নেই।

এর আভিধানিক অর্থ হলো- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।

অর্থাৎ, “গীবত” শব্দের মধ্যে এমন অর্থ নিহিত আছে যেখানে আলোচ্য ব্যক্তি উপস্থিত নয়।

গীবতের ভাষাগত সংজ্ঞা-

ভাষাগতভাবে গীবত হলো :-

কাউকে অনুপস্থিত অবস্থায় তার এমন বিষয় বলা, যা সে উপস্থিত থাকলে অপছন্দ করত।

ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (রহঃ) বলেন —

“الغيبة هي ذكر الإنسان بما يكره، سواء أكان في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله.”

অর্থাৎ — “গীবত হলো মানুষের এমন কিছু উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে — তা তার দেহ, বংশ, চরিত্র বা কাজ সম্পর্কিত যাই হোক না কেন।”

শরীয়তের দৃষ্টিতে গীবতের সংজ্ঞা-

রাসূলুল্লাহ ﷺ গীবতের সঠিক সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নলিখিত হাদীসে —
«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

**“তোমরা কি জানো ‘গীবত’ কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমার ভাই যে কথা অপছন্দ করে তার সম্পর্কে সে কথা বলার নাম গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার ‘গীবত’ করলে। আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে”।[1
(সহীহ্ মুসলিম ;মিশকাত,হাদীস নং ৪৮২৮)।**

অতএব, গীবতের অর্থ ও পরিচয় থেকে স্পষ্ট হয় যে;-
গীবত হলো অন্যের অনুপস্থিতিতে তার সত্য দোষ এমনভাবে বলা, যা সে শুনলে কষ্ট পাবে।

গীবত কী বা কাকে বলে

জিহ্বা একটি মাংসপিণ্ড হলেও এটি হৃদয়ের দ্বার। এটি অন্তরের খবর সরবরাহ করে। এটি যেমন মানুষকে ধ্বংসের অতল গহব্বরে ডুবাতে পারে, তেমনি সাফল্যের শীর্ষেও সমাসীন করতে পারে।

তাই অযথা এ অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় কথা থেকে জিব্বাকে নিয়ন্ত্রণ রেখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাই ঈমানের অনিবার্য দাবি।

বাস্তবঅর্থে গীবত বলা হয় —

যখন কেউ তার অনুপস্থিত ভাই বা বোনের সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা সে উপস্থিত থাকলে অপছন্দ করত, এমনকি কথাটি সত্য হলেও।

উদাহরণ:

যদি কেউ বলে — “ও খুব রাগী”, এবং কথাটি সত্য হয় — তবুও সেটি গীবত।
কারণ, সে বিষয়টি শুনলে মনঃকষ্ট পাবে।

কুরআনের আলোকে গীবত

আল্লাহ তায়ালা বলেন —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ(সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২)।

“হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে বিরত থাকো; কারণ কিছু অনুমান পাপ। তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না, এবং একে অপরের গীবত করো না।
তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে।
অতএব আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।”

এই আয়াতে গীবতের ভয়াবহতা এমনভাবে উপমা দেওয়া হয়েছে
যেন গীবত করা মানে আত্মিকভাবে নিজের ভাইয়ের মৃত দেহ ভক্ষণ করা।

হাদীস শরীফে এক সাহাবীর কথা এসেছে, যিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কাকে বলে?

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, আপন ভাইয়ের আলোচনা তার পেছনে এমনভাবে করা যা তার নিকট পছন্দনীয় নয়। অর্থাৎ সে পরবর্তীতে যদি জানতে পারে তার সম্পর্কে অমুক মজলিসে এ আলোচনা হয়েছে তাহলে মনে কষ্ট পাবে। এটাই গীবত।

সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে দোষ নিয়ে আলোচনা করেছি তা যদি সত্যি সত্যি আমার ভাইয়ের মাঝে থাকে?

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, আসলেই যদি দোষ থাকে তাহলেই গীবত হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার হবে। (আবু দাউদ, বাবলু গীবাত ৪৮৭৪)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-এ লিখেছেন —

"গীবত হলো মানুষের অন্তরের এক রোগ, যা অহংকার, হীনমন্যতা ও ঈর্ষা থেকে জন্ম নেয়।"

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (রহঃ) গীবত নিয়ে বলেন,

'গীবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ক্রটি নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে। চাই সেই দোষ-ক্রটির সম্পর্ক তার দেহ-সৌষ্ঠব, দ্বীনদারিতা, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি, চরিত্র, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ি, পোষাক, চলাফেরা, ওঠা-বসা, আনন্দ-ফুর্তি, চরিত্রহীনতা, রূঢ়তা, প্রফুল্লতা-স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্য যেকোন কিছুর সাথেই হোক না কেন। এসবের আলোচনা আপনি মুখে বলে, লিখে, আকার-ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায়, হাত দিয়ে, মাথা দুলিয়ে বা অন্য যেকোন উপায়েই করুন না কেন, তা গীবত'।

মোটকথা কারো মধ্যে যদি সত্যিকারার্থেই কোন দোষ-ক্রটি থাকে, আর সেটা নিয়ে আলোচনা করা যদি তিনি অপসন্দ করেন, তাহ'লে সেই সত্যি কথাটা অপরকে বলে দেওয়ার নামই হ'ল গীবত বা পরনিন্দা। আর যদি সেই দোষ তার ভিতর না থাকে, তবে সেটা 'বুহতান' বা অপবাদ।

গীবতের কতিপয় পরিভাষা

গীবত (الغِيبَة) একটি বহুমাত্রিক ইসলামি নৈতিক পরিভাষা, যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আরও কয়েকটি শব্দ কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই পরিভাষাগুলোর প্রত্যেকটি নৈতিক অবক্ষয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এদের পার্থক্য বোঝা অপরিহার্য, কারণ একটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, অপরটির পদ্ধতি ও ফলাফল একে অপরের থেকে পৃথক।

হাসান আল-বাসরী (রহঃ) বলেন —

"গীবতের তিনটি ধরন আছে, যা আল্লাহর কিতাব কুরআনে উল্লেখিত — গীবত, ইফ্ক এবং বুহতান।"

এগুলো ছাড়াও গীবতের আরো অনেক পরিভাষা রয়েছে। যা আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদিস থেকে পাই।

অতএব, ইসলামী চিন্তায় গীবতকে বোঝার জন্য এ সম্পর্কিত পরিভাষাগুলোর বিশ্লেষণ আবশ্যক।

১. গীবত (Al-Ghaybah)(পরনিন্দা) :

গীবত হলো অন্যের অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বা ত্রুটি বর্ণনা করা, যা সে শুনলে কষ্ট পাবে — যদিও কথাটি সত্য হয়।

হাদীসে এসেছে **;**

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

"তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে শুনলে অপছন্দ করবে।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৯)

অতএব, গীবত এমন এক নৈতিক অপরাধ, যার মূল উপাদান হলো

"অন্যের অনুপস্থিতিতে তার মর্যাদাহানি"।

এটি কথার দ্বারা, ইঙ্গিতে, এমনকি নীরব সম্মতিতেও সংঘটিত হতে পারে।

২. الإفك(আল-ইফ্ক) — মিথ্যা রটনা :

ইফক এর অর্থ যাচাই ছাড়া কারো সম্পর্কে মিথ্যা বা ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করা।

ইফ্ক মূলত এমন অভিযোগ বা রটনা, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অন্যের সম্মান নষ্টের উদ্দেশ্যে ছড়ানো হয়।

ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত "ইফ্ক"-এর ঘটনা ঘটেছিল উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নিয়ে, যেখানে ভিত্তিহীন অভিযোগ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তাছাড়া কুরআনে এসেছে;

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ

"**নিশ্চয়ই যারা এই মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেছিল, তারা তোমাদেরই একদল।**"

(সূরা আন-নূর: আয়াত ১১)

৩. البهتان /القذف — বুহতান / কযফ (Al-Buhtan / Al-Qadhf) :

এগুলোর অর্থ; মিথ্যা অপবাদ; প্রলাপ ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। (قذف বিশেষত অনৈতিক দায় আরোপ—যেমন জিনায়ে সহমর্মিতার মিথ্যা অভিযোগ—বর্ণনা করে)।

বুহতান হলো সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষ আরোপ — কথাটা ভিত্তিহীন। কযফ (قذف) কুরআনি ও শারীয়ত প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যৌন অপরাধ বা অনৈতিক কাজ সম্পর্কে মিথ্যা আক্ষেপ আরোপকে নির্দেশ করে এবং এতে কঠোর শাস্তি বর্ণিত।

কুরআনে:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"যে সব লোক মুমিন পুরুষ ও নারীদের এমন কারণে কষ্ট দেয় যা তারা করে নি, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"

(সূরা আল-আহযাব: আয়াত ৫৮)

গীবত ও বুহতানের মধ্যে পার্থক্য হলো —

গীবত সত্য কথা হলেও তা অপছন্দনীয়, কিন্তু বুহতান সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বুহতান সমাজে অবিশ্বাস, বিভেদ ও নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

8. النميمة (আন-নামিমাহ) — চোগলখোরি :

চোগলখোরি; একটি ব্যক্তির কথা অন্যকে বলে বিভেদ বা শত্রুতা উসকে দেওয়া।

নামিমাহ হলো কারও কথাকে বা খবরকে এমনভাবে আনাগোনা করা, যাতে শত্রুতা, বিরোধ বা অশান্তি সৃষ্টি হয় — সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে।

নামিমাহের উদ্দেশ্য প্রায়শই সম্পর্ক ভাঙা, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি বা মহলে অশান্তি সৃষ্টি করা।

হাদীস:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৫)

ইবনু হাজর (রহঃ) বলেন,

"গীবত ও নামিমাহ এক জিনিস নয়। নামিমাহ হলো ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অন্যের কথা ছড়িয়ে দেওয়া, আর গীবত হলো অনুপস্থিত ব্যক্তির ত্রুটি বর্ণনা।"

অতএব, গীবতের উদ্দেশ্য সবসময় দুষ্কামনা না হলেও নামিমাহর উদ্দেশ্য প্রায়শই শত্রুতা সৃষ্টিকারী।

৫. الهمزة و اللمزة (আল-হুমাযাহ ও আল-লুমাযাহ) — সম্মুখ ও পশ্চাতে নিন্দা :

হুমাযাহ — সম্মুখে নিন্দাকারী; লুমাযাহ — পশ্চাতে নিন্দাকারী।

কুরআনে রয়েছে :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"ধ্বংস প্রতিটি মুখনিন্দাকারী ও পশ্চাতে পরনিন্দাকারীর জন্য।"

(সূরা আল-হুমাযাহ: আয়াত ১)

আবুল আলিয়াহ (রহঃ) বলেন —

"হুমাযাহ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের মুখোমুখি নিন্দা করে, আর লুমাযাহ সে, যে অনুপস্থিত অবস্থায় নিন্দা করে।"

অতএব, গীবত ও লুমাযাহ প্রায় সমার্থক; দু'টিই নৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্ন।

৬. الشتم (আশ-শাত্ম) — কটূক্তি ও ব্যঙ্গ :

এর অর্থ কাউকে গালি দেওয়া, তিরস্কার করা, ব্যঙ্গ করা বা কটূক্তি করা।

শাত্ম হলো মৌখিক বা লিখিতভাবে কারো মর্যাদাহানি করা।

সাধারণ মানুষের প্রতি কটূক্তি করা পাপ, কিন্তু নবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি করলে তা ইসলামী শরীয়তে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য।

৭. التجسس

তাজাসসুস(At-Tajasus) :

অর্থ গোপন অনুসন্ধান; অন্যের গোপন দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা।

তাজাসসুস সাধারণত গোপনে একজনের ব্যক্তিগত জীবন, ভুল বা গোপন বিষয় খোঁজার মানসিকতা/চেষ্টা। এরপর তৎবিষয় প্রচার করা হলে তা গীবত বা নামিমাহে পরিণত হতে পারে।

কুরআন "تَجَسَّسُوا" (গোপনে অনুসন্ধান করা) থেকে সতর্ক করে।

গীবতের নানাবিধ উৎস বা মাধ্যমসমূহ :

গীবত এমন এক নৈতিক ব্যাধি যা কেবল জিহ্বার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চিন্তা ও আচরণও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ইসলাম গীবতকে একটি বহুমাত্রিক অপরাধ হিসেবে দেখিয়েছে—যেখানে হৃদয়, দৃষ্টি, ইঙ্গিত, লেখা এমনকি ইবাদতের আড়ালেও গীবতের প্রকাশ ঘটতে পারে।

কুরআন-হাদীস ও মান্য আলেমরা বারবার সতর্ক করেছেন যে গীবত-সংক্রান্ত আচরণ নানা মাধ্যমেই সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি করে।
নিচে গীবতের বিভিন্ন মাধ্যম ও তাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো:—

১.মুখের বা জিহ্বার গীবত:

জিহ্বা চুরির থেকেও খুব ধারালো অস্ত্র। গীবতের প্রধান মাধ্যমই জিহ্বা।অর্থাৎ, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ, ত্রুটি, বা অপছন্দনীয় বিষয় মুখে বলা।

শুধু অতীতে না বর্তমানেও আলাপচারিতা, কথা-বার্তা ও বক্তৃতায় যবানের বা জিহ্বার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী গীবত হয়।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ،

‘নিশ্চয়ই বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করে না। অথচ এ কথার মাধ্যমে সে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের সমপরিমাণ’।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন,إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ،

‘বান্দা কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে, যার গুরুত্ব সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ এ কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে’।

একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে চলে যাওয়ার পর, অপর এক ব্যক্তি তার গীবত করে এবং তার দোষ ত্রুটির বর্ণনা করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– হে লোক, তুমি দাঁত খেলাল করো। তিনি বললেন –ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আজ গোশত খাইনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এই মাত্র এক মুসলিম ব্যক্তির গোশত খেলে।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যখন কেউ একজন ব্যক্তির অনুপস্থিত দোষী ভাইয়ের নামে গীবত করে, তখন সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত আহার করে। তাই জিহ্বা বা জবানের হেফাজত অনেক জরুরি।

২. কানের গীবত :

কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাদানা দেওয়া তাতে বাদা না দেওয়া কানের গীবত শ্রবণ করা ও রা দিয়ে নীরব থাকা ও এক প্রকারের গীবত।

হাদীস থেকে বর্নিত
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

السَّامِعُ أَحَدُ الْمُغْتَابَيْنِ

"গীবত শোনাকারীও গীবতকারীর অংশীদার।"

তিনি আরো বলেছেন,কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাকে এভাবে সাহায্য কর যে তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে গীবত কারীদের কেউ বাধা প্রদান কর অতঃপর স্থান ত্যাগ কর।

৩. অন্তরের গীবত :

অন্তরের গীবত হলো:

কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বা ত্রুটি সম্পর্কে মনঃপূর্বক বিরূপ ধারণা রাখা, হিংসা বা অবজ্ঞা পোষণ করা, যা সে শুনলে অপছন্দ করত।

তার মানে, এটি এমন গীবতের রূপ যা মৌখিক বা লিখিত প্রকাশ ছাড়াই অন্তরে বিদ্যমান থাকে।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবশত, মনে মনে কুধারণা পোষণ করা এবং খোদাভীরু সৎকর্ম -পরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রমাণাদি ছাড়াই মনের মধ্যে খারাপ ধারণা পুষে রাখাই হল অন্তরের গীবত।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ’তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না’

(হুজুরাত ৪৯/১২)।

এছাড়াও এ নিয়ে ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, الْغِيبَةُ بِالْقَلْبِ هِيَ أَنْ تَظُنَّ بِهِ السُّوْءَ

‘অন্তরের গীবত হচ্ছে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা’।

ইমাম মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন,قد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين،

‘মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত সংঘটিত হয়’।

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষ যা মুখে বলে তাও জানে আর মানুষ যা অন্তরে পুষে রাখে তাও জানেন।

অপরদিকে শয়তানের কাজ হচ্ছে মানুষের মনে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করা, মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা বা সন্দেহের জন্ম দেওয়া। তাই বান্দা যখন কাউকে কাউকে নিয়ে খারাপ ধারণা পোষণ করে তখন শয়তানকে সত্যায়ন করা হয়ে যায়। যেহেতু শয়তানকে সত্যায়ন করা হারাম তাই কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করাও হারাম।

অন্তরের গীবত মুখে প্রকাশ না হলেও এর প্রভাব এতই গভীর যে, এটি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা দূষিত করে।

কুরআন ও হাদীস স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন—মুমিনের উচিত অন্তরের সততা বজায় রাখা, অনুমান ও খারাপ ধারণা থেকে বিরত থাকা।

৪. ইশারা- ইঙ্গিতের গীবত:

ইশারাভিত্তিক গীবত হলো–

মুখে কোনো কথাই না বলেই অঙ্গভঙ্গি, হাতের ইশারা, চোখের ইঙ্গিত বা শরীরের অন্য কোনো ক্রিয়া দ্বারা অন্যের দোষ বা ত্রুটি বোঝানো।

অর্থাৎ সরাসরি নাম না উল্লেখ করে এমন কিছু ইঙ্গিতবহ উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে।

এ নিয়ে ইতিহাসেও একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে।

একদা আয়েশা (রাঃ) বলেন,دَخَلَت امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقُلْتُ بِإِبْهَامِي هَكَذَا، وَأَشَرْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَبْتِهَا،

‘একজন খাটো মহিলা (আমাদের ঘরে) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসেছিলেন। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এভাবে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ ‘সে তো বেঁটে মহিলা’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘তুমি তো তার গীবত করে ফেললে’।

অপর বর্ণনায় সেই আগন্তুক মহিলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম,حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ :تَعْنِي قَصِيرَةً، ‘ছাফিইয়াহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তিনি এরূপ অর্থাৎ খাটো প্রকৃতির। তিনি বললেন,لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، ‘তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে’।

আয়েশা (রাঃ) বলেন

‘ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ :مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا،

(আরেক দিন) আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেওয়া হ’লেও আমি কারো অনুকরণ পসন্দ করবো না’।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ‘আয়েশা (রাঃ) গীবত করার উদ্দেশ্যে ছাফিয়্যা (রাঃ)-এর দোষ বর্ণনা করেননি; বরং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তার ব্যাপারে খবর দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তথাপি সেটা গীবতের পর্যায়ভুক্ত ছিল’।

তাই বলা যায় যে,ইশারা বা অঙ্গভঙ্গি-ভিত্তিক গীবত মুখে বা লিখিত নয়, তবুও অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইসলামী নৈতিকতায় এটি গীবতের সমতুল্য এবং এতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের ক্ষতি হয়।

তাই মুমিনের কর্তব্য হলো অঙ্গভঙ্গি ও ইশারার মাধ্যমে অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করা।

৫. কলমের বা লেখার গীবত :

ইসলাম ধর্ম শুধু মুখের কথা নয়, বরং লিখিত বক্তব্য ও চিন্তার প্রকাশকেও নৈতিক দায়িত্বের আওতায় এনেছে।যেভাবে মুখে কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বলা গীবত,ঠিক তেমনি লেখার মাধ্যমে, বার্তা, চিঠি, সামাজিক মাধ্যম, সংবাদ বা মন্তব্যের মাধ্যমে কারো দোষ প্রকাশ করাও গীবত— এমনকি আরও ভয়াবহ, কারণ এটি অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

লেখার গীবত হলো—

কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বা ত্রুটি লিখিতভাবে প্রকাশ করা, প্রচার করা, মন্তব্য করা বা ইঙ্গিত করা, যা সে শুনলে বা পড়লে অপছন্দ করবে।

অর্থাৎ, মুখের বদলে কলম বা লেখার মাধ্যমে গীবতের প্রকাশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ كَتَبَ كَلِمَةً يُغْتَابُ فِيهَا مُسْلِمٌ فَهُوَ كَغَائِبٍ فِيهِ

"যে ব্যক্তি এমন কোনো কথা লিখে, যাতে একজন মুসলিমের পরনিন্দা হয়, সে গীবতকারীরই সমান।"

ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহফ আল-কাহত্বানী (রহঃ) বলেন, 'গীবত শুধু মুখের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গীবতকারী যে কোন মাধ্যমে অপরের কুৎসা রটাতে পারেন। হ'তে পারে সেটা ইশারা-ইঙ্গিত, কাজ-কর্ম, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভেংচানো, খোঁটা দেওয়া ও লেখালেখির মাধ্যমে অথবা যার নিন্দা করা হচ্ছে তিনি অপসন্দ করেন এমন যে কোন মাধ্যমে'।

সুতরাং লেখার গীবত মুখের গীবতের মতোই ভয়াবহ, বরং এটি স্থায়ী প্রমাণ হিসেবে মানুষের মনে এবং সমাজে থেকে যায়।

ইসলামী দৃষ্টিতে কলম এমন এক আমানত, যা দিয়ে কেবল সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের বার্তা প্রচার করা উচিত।

তাই একজন মুসলিমের কর্তব্য—তার কলম যেন কারো মানহানি বা অপমানের মাধ্যম না হয়।

৬.সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত

ইসলামে গীবতের নিষেধাজ্ঞা শুধু মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এমন সব আচরণ, ভঙ্গি বা ইঙ্গিতও গীবতের মধ্যে পড়ে যা কারো দোষ, ত্রুটি বা দুর্বলতাকে অন্যের সামনে তুলে ধরে। তাই সরাসরি কথা বলে গীবত করা যেমন হারাম, তেমনি অভিনয় করে বা অঙ্গভঙ্গি নকল করেও কারো ত্রুটি প্রকাশ করা সমানভাবে গীবত।

অনেক সময় মানুষ কারো উচ্চারণ, হাঁটা, কথা বলার ধরন, শারীরিক দুর্বলতা বা কোনো অভ্যাসকে নকল করে হাসাহাসি করে, অথবা সেই ব্যক্তির দোষ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে অঙ্গভঙ্গি করে—এটা ভাষার গীবতের মতোই নিন্দনীয়।

কারণ এখানে উদ্দেশ্য একই—কোনো মানুষের অসম্মান করা বা তাকে ছোট করে অন্যের সামনে উপস্থাপন করা।

ইমাম নববী (রহ.) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ‘কারো আচরণ বা বৈশিষ্ট্যকে অনুকরণ করে তাকে হেয় করা—এটিও গীবত।’ এতে বোঝা যায়, শুধু শব্দ নয় বরং যে কোনো ধরনের প্রকাশভঙ্গি যা তাকে অপমানিত করে, তা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়ের শামিল।

সুতরাং ইসলামী আদর্শে গীবতের নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত বিস্তৃত। একজন মুসলিমের উচিত এমন কোনো কথা বা ইঙ্গিত থেকে দূরে থাকা যা অন্য কাউকে ছোট বা অপমানিত করে। সামাজিক সম্পর্ক, মানবিক মর্যাদা এবং ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে এ নৈতিক বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গীবতের প্রকারভেদ

○ গীবত বা পরনিন্দা সাধারণত ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ একটি কাজ। তবে ইসলামী শরীয়ত অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক বিধানপ্রদানকারী হওয়ায়, সব গীবত একই পর্যায়ের নয়।

○ কিছু গীবত আছে যা সম্পূর্ণ হারাম (নিষিদ্ধ), কিছু ওয়াজিব (অবশ্য করণীয়) আবার কিছু মুবাহ বা জায়েজ (অনুমোদিত)।

○ এই শ্রেণিবিন্যাস প্রথম বিস্তারিতভাবে করেন ইমাম নববী (রহ.), পরে তা বিশ্লেষণ করেন ইমাম গাযজালী (রহ.), ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.), ও ইমাম শারানী (রহ.) প্রমুখ ইসলামি চিন্তাবিদ।

১. হারাম গীবত :

যে গীবতের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের সম্মান, মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান ক্ষুণ্ণ হয়, এবং যার উদ্দেশ্য তুচ্ছ করা, ঘৃণা ছড়ানো বা হেয় করা — তা হারাম গীবত।

এ ধরনের গীবত ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“গীবত ব্যভিচারের চেয়েও ভয়াবহ।”
(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ১৯২০)

তাই বলা যায়,এই ধরণের গীবত মানুষের মধ্যে শত্রুতা, বিভেদ, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ উভয়েই এমন আচরণ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন :

✔ কারো দেহ, রূপ বা পোশাক নিয়ে উপহাস করা।

✔চরিত্র, পরিবার বা পেশা নিয়ে নিন্দা করা।

✔রাগ বা ঈর্ষার কারণে কারো দোষ অন্যের সামনে বলা।

২. ওয়াজিব গীবত :

যে গীবতের মাধ্যমে অন্যায় রোধ করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা বা কাউকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যায়, তা ওয়াজিব গীবত। অর্থাৎ এটি করা ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় দেখেও চুপ থাকে, সে নিজেও অপরাধী।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৮০)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন —

"**যদি কোনো ব্যক্তির অন্যায় প্রকাশ করা মানুষের উপকারে আসে বা ক্ষতি প্রতিরোধ করে, তবে সে গীবত নিন্দনীয় নয়; বরং তা ওয়াজিব।**"

উদাহরণসরূপ;

✔ প্রতারক, মুনাফেক বা অপরাধীর অন্যায় প্রকাশ করা, যেন অন্যরা প্রতারিত না হয়।

✔ বিচার বা সাক্ষ্য প্রদানে সত্য ঘটনা প্রকাশ করা, যেমন আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া।

✔ধর্মীয় পরামর্শ বা ফতোয়া নেওয়ার সময় কারো আচরণ উল্লেখ করা, যেন শরয়ি হুকুম জানা যায়।

✔কোনো শিক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করা, যেন সে ভুল পথে না যায়।

এ ধরনের গীবত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

তবে এখানে উদ্দেশ্য হতে হবে "সংশোধন", "সতর্কতা", বা "ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা" — অপমান বা বিদ্বেষ নয়।

৩.মুবাহ বা জায়েজ গীবত:

যে গীবত শরয়ি দৃষ্টিতে অনুমোদিত — অর্থাৎ এতে কোনো পাপ বা ক্ষতি নেই, বরং উপকার রয়েছে — সেটি মুবাহ বা জায়েজ গীবত।

ইমাম নববীর বর্ণনা অনুযায়ী, ছয়টি ক্ষেত্রে গীবত জায়েজ / অনুমোদিত ;

১ অন্যায়ের বিচার চাওয়ার সময়;

যেমন: "হে বিচারক! অমুক আমার প্রতি অন্যায় করেছে।"

→ এখানে উদ্দেশ্য নিজের অধিকার ফেরত পাওয়া।

২ অন্যকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য;

যেমন: কাউকে প্রতারক, মিথ্যাবাদী বা সহিংস ব্যক্তির সম্পর্কে সাবধান করা।

৩ ফতোয়া বা পরামর্শ চাওয়ার সময়;

যেমন: "অমুক ব্যক্তি আমার স্বামী/বন্ধু হিসেবে খারাপ আচরণ করছে, শরিয়তের দৃষ্টিতে আমি কী করব?"

৪ প্রকাশ্যে পাপকারীর গীবত;

যেমন: কেউ যদি প্রকাশ্যে চুরি, মদ্যপান বা অন্যায় করে, তবে তার ব্যাপারে সতর্ক করা জায়েজ।

৫ পরিচয় নির্ধারণের জন্য;

যেমন: "ও খোঁড়া আলী", "ও মোটা রফিক" — যখন উদ্দেশ্য শুধুই শনাক্ত করা, অপমান নয়।

৬ সতর্কতা বা নসিহতের উদ্দেশ্যে;

যেমন: কেউ যদি খারাপ বন্ধু বা ক্ষতিকর দলের সদস্য হয়, তবে অন্যকে সতর্ক করা।

(সূত্র: ইমাম নববী, রিয়াদুস সালেহিন; আল-আযকার)

মুবাহ গীবতের ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য ও সীমা গুরুত্বপূর্ণ। যদি কারো উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত প্রতিশোধ হয়, তবে তা আর মুবাহ থাকবে না — বরং হারাম হয়ে যাবে।

সুতরাং, ইসলাম গীবতকে সাধারণভাবে মহাপাপ হিসেবে ঘোষণা করেছে, তবে ন্যায় ও উপকারের উদ্দেশ্যে কিছু সীমিত ক্ষেত্রের অনুমতি দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন —

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলো।"

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৮৩)

অতএব, মুসলমানের মুখে এমন কথা থাকা উচিত যা সমাজে শান্তি আনে, বিভেদ নয়।

গীবতের ধরনসমূহ

গীবত বলা হয় অপরের এমন সমালোচনা, যা শুনলে তার খারাপ লাগবে বা মন খারাপ হবে।

এই সমালোচনা অন্যের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত দোষ, চারিত্রিক ত্রুটি, কাজ-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া সম্পর্কিত দোষ হ'লেও তা গীবত।

এটি এমন এক গুনাহ, যা করার সময় আমাদের মনে হয় না--আমরা যে গুনাহ করছি।

গীবতের ক্ষতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো; যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় গীবত কারীর সওয়াব চলে যায় এবং গীবতকারীর আমলনামায় যার গীবত করা হয়; তার গুনাহ চলে আসে।

গীবতের রকমভেদ বা ধরন সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে।

এখানে ইমাম নববী (রহঃ)-এর 'আল-আযকার', ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' এবং 'মাওসূ'আতুল আখলাক্ব' থেকে একত্রে এবং সংক্ষিপ্তাকারে গীবতের ধরনগুলো তুলে ধরা হ'ল–

- **দৈহিক কাঠামোর গীবত**

মানুষের দেহ-গঠন, রূপ-রঙ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরনিন্দা করা ইসলামে অন্যতম জঘন্য গীবতের রূপ।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কারো শারীরিক গঠন বা চেহারা নিয়ে উপহাস বা সমালোচনা করা মানে আল্লাহর সৃষ্টিকে তুচ্ছ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إنَّ اللهَ لا ينظُرُ إلى صُوَرِكم وأموالِكم، ولكن ينظُرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দার যেকোনো ধরনের গীবতকে হারাম ঘোষণা করেছেন যেরূপ তিনি মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়াকে হারাম করেছেন"।

এ নিয়ে আমরা পূর্বে সাহাবীদের যুগে অনেক ঘটনা দেখতে পাই।

এমনই একদিন এক সাহাবী এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ্যপূর্বক বললেন, সে এক আজব লোক; কেউ তাকে খাদ্য দিলে সে সব খেয়ে ফেলে, কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয় রোজগার করে না।

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, কারো ত্রুটি ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেন, বাস্তবিক পক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট।

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে খুবই দুর্বল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন –তুমি তার গীবত করেছ এবং তার গোস্ত খেয়েছো।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে ছোট বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম।

যেমন :এভাবে বলা হয় যে; অমুক ব্যক্তি খুবই স্থুলদেহী বা বেটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট, অথবা দেখতে খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখেনা নাক কাটা এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করে তাকে অপমান করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উপরোক্ত উদাহরণ গুলো বা ঘটনা দেখলে বুঝা যায় যে, এরকম কতশত কথা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করছি, যেগুলো গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

তাই যদি এমন হয়, তাহলে এখনি আমাদের ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

গীবতের ভয়ানক চিত্র আমাদের চারপাশে গাছের চাড়ার মতো ফুটে উঠেছে, আর আমরা প্রতিনিয়তই গীবতের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি বেড়ে ওঠা আগাছার মতো।

- **পোষাক-পরিচ্ছদের গীবত**

মানুষের বাহ্যিক চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ বা সাজসজ্জা নিয়ে নিন্দা, উপহাস কিংবা ব্যঙ্গ করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করেছে তার পোশাক বা বাহ্যিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে নয়, বরং তার তাকওয়া ও আখলাকের মাধ্যমে।

উদাহরণসমূহ:

✔ ওর জামাটা দেখেছো? একদম হাস্যকর।

✔ ও তো সবসময় পুরনো কাপড় পরে, মনে হয় দরিদ্র!

✔ ওর পোশাক দেখে মনে হয় নাটক করছে।

✔ ওর জুতাগুলো এত সস্তা, দেখলে হাসি পায়।

এ ধরনের মন্তব্য অনেক সময় সাধারণ মনে হলেও, ইসলামী দৃষ্টিতে তা গুরুতর পাপ।

তাই যখন কেউ কারো পোশাক, পর্দা, সাজসজ্জা, জুতা, অলংকার বা বাহ্যিক রুচি নিয়ে নিন্দা করে, তখন সে গীবতের অপরাধে লিপ্ত হয়। এমনকি ইঙ্গিত বা ঠাট্টা করেও যদি কারো পোশাককে ছোট করা হয়, তাহলেও তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে।

- **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত**

নিজের হাত-পা ইত্যাদির ইশারায় অন্য ব্যক্তির কাছে ভিন্ন কোনো ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করাটাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হলো গীবত।

মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিন্দা, উপহাস, বা খোঁচা দেওয়া গীবতের এক গুরুতর রূপ।

ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে —

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিভিন্ন রূপ, রঙ ও আকারে সৃষ্টি করেছেন; কেউ লম্বা, কেউ খাটো, কেউ মোটা, কেউ রোগা — এগুলো সবই আল্লাহর হিকমত (জ্ঞান ও উদ্দেশ্য) অনুযায়ী।

অতএব, কারও শরীর বা অঙ্গ নিয়ে উপহাস করা মানে আসলে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তাচ্ছিল্য করা।

আল্লাহ তায়ালার কুরআনে বলেছেন,

"لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।"

(সূরা আত-তীন, আয়াত ৪)।

এই আয়াত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, প্রতিটি মানুষের শারীরিক গঠন আল্লাহর নির্ধারিত ও সর্বোত্তম ভারসাম্যের প্রকাশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"কোনো মুসলিম ব্যক্তির তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইঙ্গিত করা বৈধ নয়; যাতে সে মর্মাহত হয়"

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযাহর প্রতি অভিশাপ”।

‘হুমাযাহ ও লুমাযাহ’ শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে কোরআনের ভাষ্যকারদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ ইবনে জুরাইয রহিমাহুল্লাহর সূত্রে উল্লেখ করেছেন;

যে ব্যক্তি চোখ বা হাতের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয়, তাকে বলা হবে লুমাযাহ এবং যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয়, তাকে বলা হবে লুমাযাহ।

তাই এ ধরনের গীবত থেকে আমদের বেঁচে থাকতে হবে।

- **পোশাক-পরিচ্ছেদের গীবত**

পোশাক ও বাহ্যিক সাজসজ্জা নিয়ে নিন্দা, উপহাস বা ব্যঙ্গ করা গীবতের এক সূক্ষ্ম ও প্রচলিত রূপ।

সমাজে মানুষ প্রায়ই পোশাকের ধরন, দামী বা সস্তা কাপড়, রুচি কিংবা সাজসজ্জা নিয়ে মন্তব্য করে যা ইসলামী নৈতিকতার পরিপন্থী।

যেমন বলা, অমুক ব্যক্তি কৃপণ তাই কৃপণের মতো পোশাক পরে, অমুক নারী এমন ভাবে উড়না পরিধান করে যে তার অভ্যন্তরীণ অংশ খোলা থাকে ইত্যাদি।

ইমাম গাযজালী (রহ.) এর মতে —

মানুষ যখন অন্যের পোশাক, সাজসজ্জা বা পরিধান পদ্ধতি নিয়ে নিন্দা করে, তখন সে আসলে নিজের অহংকার প্রকাশ করে।

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি অন্যের পরিধেয়কে হেয় করে, সে নিজের অন্তরে তাকওয়া হারিয়ে ফেলে।”

ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন —

পোশাকের বাহ্যিকতা মানুষকে পরিমাপের মানদণ্ড নয়।

কেউ যদি কারও পোশাক বা চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করে, তবে সে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তাচ্ছিল্য করে।

একদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহি বলেন,

অমুক স্ত্রীলোকের আঁচল খুব লম্বা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বলেন: হে আয়েশা। তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা:) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরো বের হয়ে আসে।

এছাড়াও বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো; অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে।

- **অভ্যাস ও চারিত্রিক আচার-আচরণের গীবত**

মানুষের চরিত্র, স্বভাব, আচরণ বা দৈনন্দিন ব্যবহারের সমালোচনা করা গীবতের এক গুরুতর ধরন।

এ ধরনের গীবত অনেক সময় "সততার মুখোশে" বা "ভালো উদ্দেশ্যে" বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অন্যের মানহানি ও সম্মানহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু,দুর্বল,অলস,কর্মবিমুখ,একেবারে নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় ওঠাবসা করে ইত্যাদি হতে পারে।

এক সফরে আবু বকর ও উমর (রা:) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী ছিলেন।তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গোস্ত খেতে চাইলে তিনি বলে পাঠান; তোমরা কি তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের গোশত তৃপ্তি সহকারে আহার করোনি?তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমাদের ভাগ্যে গোশত জুটেনি। তিনি বলেন: তোমরা

অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ, আর কারো গীবত করা তার দেহের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। তারা উভয়ে বলেন, আমরা তো শুধু এতোটুকু বলেছি যে ,লোকটি দুর্বল, আমাদের খেদমত করতে পারেনা।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটাও বলো না, কারো ক্ষুদ্র ত্রুটিও বর্ণনা করো না।

একদা সালমান ফারসী (রা) আহার করে শুয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তার খাওয়া ও শোয়ার সমালোচনা করলে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়:

ولا يغتب بعضكم بعضا

"তোমরা পরস্পরের গীবত করো না"।

অত্র আয়াতে গীবত হারাম করা হয়েছে।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন —

"মানুষের নৈতিক ত্রুটি নিয়ে মন্তব্য করা, যেমন: তাকে অলস, মূর্খ, রূঢ়, বা ভণ্ড বলা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।"

- **বংশের গীবত**

মানুষের পারিবারিক পটভূমি, বংশধারা, সামাজিক অবস্থান বা জন্মসূত্র নিয়ে নিন্দা, অপমান বা উপহাস করা হলো "বংশের গীবত"।

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়।কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত নিন্দনীয়, কারণ ইসলাম মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে বংশ নয়, বরং তাকওয়া বা ধর্মভীরুতা নির্ধারণ করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান সে, যে সবচেয়ে পরহেজগার।"

(সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে বংশ বা জাত নয়, বরং তাকওয়াই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহ তোমাদের পূর্বের অহংকার ও বংশীয় গৌরবকে মুছে দিয়েছেন। মানুষ কেবলমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমে একে অপরের থেকে শ্রেষ্ঠ।"

(মুসলিম, হাদীস: ২৮৫৬)

আরও বলেছেন,

"যে ব্যক্তি বংশগৌরব নিয়ে অহংকার করে, সে জাহান্নামের কয়লার টুকরোর সমান হবে।"

(আবু দাউদ, হাদীস: ৫১১৬)

ইসলাম সকল মানুষকে সমান মর্যাদায় দেখতে শিক্ষা দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেন—

"কোনো আরব অ-আরবের উপর শ্রেষ্ঠ নয়,

আর কোনো অ-আরব আরবের উপর শ্রেষ্ঠ নয়;
শ্রেষ্ঠ কেবল তাকওয়ার দ্বারা।”

(মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

সুতরাং নিজেকে শরীফ বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

- **ইবাদতের গীবত**

ইবাদতের গীবত বলতে বোঝায়—কারো ধর্মীয় অনুশীলন, নামাজ, রোজা, দান, তিলাওয়াত বা অন্যান্য আমল নিয়ে ব্যঙ্গ, সমালোচনা, উপহাস করা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।

এছাড়াও কারো ধর্মীয় আমল, ইখলাস (নিয়ত), বা আল্লাহভীতি নিয়ে পরোক্ষভাবে মন্তব্য করা বা সমালোচনা করাও গীবত।

যেমন: অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামাজ পড়ে না, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামাজ পড়ে না, রমজানের সবগুলো রোজা রাখে না, অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ পড়ে ইত্যাদি।

আবার অনেকেই বলে, অমুক লোককে আমি কোনোদিন সুন্নত, নফল করতে দেখিনি; কোনোরকম ফরজ আদায় করে চলে যায়। দৈনন্দিনে ব্যবহৃত এমন সব কথাবার্তা বলাও এক ধরনের গীবত।

একদা ‘এক ব্যক্তি কারো সমালোচনা করে বলল,আমি আল্লাহর জন্যে অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এ -কথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে বলল– ইয়া রাসুলুল্লাহ, অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী; সে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত আদায় করে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোনো রোযা

রাখেনা এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো দান- খয়রাত করে না ; তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি।
তার বক্তব্য শেষ হলে সন্তুষ্ট ব্যক্তি বলল –হে আল্লাহর রাসূল, তাকে জিজ্ঞেস করুন; আমি ফরজ আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি কি না?তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল– না, সে ফরজ আদায়ে কোনোরূপ ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু সে নফল ইবাদত করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা;তোমার জন্য সুমীচীন নয়'।

অতএব,

কারো ইবাদত কম-বেশি নিয়ে আমরা যেন সমালোচনা না করি, সমালোচনা করতে গিয়ে হয়তো প্রতিফল দিবসে দেখা যাবে, আমি ইবাদত বেশি করেও তার কারণে নিতান্তই অল্প।

অনুরূপ,

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কিছু লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী রহিমাহুল্লাহ তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এ লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো, তবে কতই না ভালো হতো।
সাদীর পিতা এ কথা শুনে বললেন, 'কতই-না ভালো হতো, যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে, তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপতো না'।

সুতরাং,

আমাদের জন্যে উচিত নয়; কারো ইবাদত নিয়ে সমালোচনা করা। আমার ইবাদত আমার জন্য।,অন্যের ইবাদত তার নিজের জন্যেই; এর প্রতিফল দেওয়ার মালিক কেবলই আল্লাহ তায়ালা।

- **গুনাহের গীবত**

গুনাহের গীবত বলতে বোঝায় — কারো পাপ বা ভুল কাজের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করা, সমালোচনা করা বা তা নিয়ে ঠাট্টা করা, যদিও সেই ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে থাকতে পারে।

গীবতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো, কারো অতীত বা বর্তমান পাপ প্রকাশ করা এবং তাকে সেই অপরাধের মাধ্যমে লাঞ্ছিত করা।

আমাদের মধ্যে যারা দ্বীনদার; তাদের মাঝে খুব বেশি একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, কেউ পাপ কাজে লিপ্ত থাকলে, গুনাহের কাজে নিমজ্জিত থাকলে, আমরা তা অতি উৎসাহী হয়ে বলে বেড়াই ;কারণ আমরা দ্বীনদার, অথচ এ কথা ভেবেও দেখি না , না হয় বুঝতে পারি না যে এর মাধ্যমে আমরা গুনাহে গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছি।

উদাহরণস্বরূপ —

এমন বলা যে,অমুক ব্যক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে বা তার অন্তর বিদ্বেষ পূর্ণ, তার মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, অমুক ব্যক্তি মদ পানে অভ্যস্ত বা চোর-ডাকাত ইত্যাদি।

হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

‘ মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্যে তিনটি জিনিসই যথেষ্ট’।

এক.নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত, অন্যকে সে অপকর্ম করতে দেখলে তার সমালোচনা করা।

দুই. অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়;অথচ নিজের দোষ সম্পর্কে অন্ধ।

তিন. নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথ কষ্ট দেওয়া, হয়রানি করা।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন—

'আল্লাহর স্মরণ-শূন্য কথা বেশি বোলো না, অন্যথায় তোমাদের ঈমান কঠিন হয়ে যাবে, আর কঠিন হৃদয় তোমাদের অজান্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না, যেমন মনিব তার গোলামের তদারক করে; বরং তোমরা নিজ নিজ দোষ ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করো এমনভাবে যে, তোমরা আল্লাহর গোলাম। মানুষ দুই ধরনের; কিছু লোক গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, আর কিছু লোক গুনহ থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করে। তোমরা কাউকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার প্রতি দয়াপরচশ হও এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করো এবং নিজে গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এবং গুনাহগারকে অপমান করো না'।

শেখ সাদী রহিমাহুল্লাহ একবার তার শিক্ষককে বললেন,

অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বললেন; হে সাদী,তোমার বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম আর তার গীবত করা কি হালাল? তুমি আমার নিকট তার গীবত করছ,তার বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে।

বনি ঈসরাইলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে;

তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো, আর অন্যজন সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকত। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সব সময় পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে হেয়- প্রতিপন্ন করতো। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি একদিন পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির উপর চটে গিয়ে বলল; আল্লাহর শপথ, তুমি জাহান্নামে যাবে। এ কথাটি আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার অপছন্দ হলো এবং তিনি ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী ও পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে জান্নাতী বানিয়ে দিলেন।

নিজের গুনাহের দিকে মনোযোগ দেওয়া অনেক উত্তম। অন্যের ভুল গোপন রাখা মানে নিজের সম্মান রক্ষা করা, আর অন্যের গীবত করা মানে নিজের নেক আমল বিনষ্ট করা।

ইসলাম তাই শেখায় — যদি তুমি কারো গুনাহ দেখো, তবে তার জন্য দোয়া করো, তার সংশোধনের চেষ্টা করো, কিন্তু কখনোই তাকে লজ্জিত কোরো না। কারণ আজ যে গুনাহ করেছে, কাল সে হয়তো তওবা করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যেতে পারে; আর আজ যে ব্যঙ্গ করছে, কাল
সে-ই হয়তো গুনাহে পতিত হবে।

- **পরোক্ষ গীবত**

পরোক্ষ গীবত বলতে এমন পরনিন্দাকে বুঝায়, যা সরাসরি না বলে ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়ে থাকে। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল-

-

কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গ বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে বলা- 'আল্লাহ তার নির্লজ্জতা থেকে পানাহ দিন' অথবা 'গোমরাহী থেকে পানাহ চাই' ইত্যাদি বলা। মূলতঃ এভাবে বলে আলোচিত ব্যক্তির নির্লজ্জতা ও গোমরাহীর কথা উল্লেখ হয়ে থাকে।

-

'কিছু লোক এই করে' বা 'কিছু মানুষ এই বলে' বলা। এই 'কিছু' শব্দের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়, তাহ'লে সেটা গীবত।

-

'অমুক পন্ডিত', 'অমুক ছাহেব', 'অমুক নেতা' ইত্যাদি তাচ্ছিল্যের সাথে বলা। অর্থাৎ দোষ বা ত্রুটি বর্ণনার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেও শ্রোতা বুঝে নিতে পারে কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে।

-

কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা 'অমুক ভাই/বন্ধু অপমানিত হওয়ার কারণে বা তার অমুক দোষ-ত্রুটির কারণে আমি কষ্ট পেয়েছি'। আলেমদের মতে, এখানে দো'আর মাধ্যমে বর্ণিত ব্যক্তির গীবত করে ফেলা হয়। কারণ তার সেই ত্রুটি গোপন ছিল, কিন্তু সে দো'আ করার মাধ্যমে সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দিল। যদি তার দো'আ করার উদ্দেশ্য থাকতো, সে নির্জনে সেই ভাইয়ের জন্য দো'আ করতে পারত।
পরোক্ষ গীবতের এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে গীবত মনে করে না। অথচ এগুলোও সর্বনাশা গীবত।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার মূল প্ররোচনা বা কারণসমূহ :

মানুষ সব সময় নিজেকে বড় করে দেখে, এ আমিত্বের আরেক নাম হলো আত্মপূজা। এটা শুরু হয়ে গেলে আত্মপ্রীতি মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠে। তখন তার আত্মত্যাগের মহৎ বৈশিষ্ট্য দূরীভূত হতে থাকে। ফলে এই স্থানে দানা বাঁধে হিংসা-বিদ্বেষ। আবার হিংসা-বিদ্বেষ থেকেই অপরের প্রতি কুধারনার সৃষ্টি হবে, যা মানুষকে গীবত করতে বাধ্য করে।

তাই বলা যায় যে,মানুষ বিভিন্ন কারণে গীবতে লিপ্ত হয়। যেমন কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো কারনে অসন্তুষ্ট হলে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের গীবতে লিপ্ত হয়। এই অসন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। শত্রুতা ও অহংকারের বশবর্তী হয়েও কোন ব্যক্তি অপরের গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে।

অনুরূপ, এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তার সাথে তাল মিলিয়ে গীবতে লিপ্ত হতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যেও তার প্রতিপক্ষ গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে।

যেসব কারণে মানুষ অপরের গীবত করে সেই সব কারণ নিজের মধ্যে থেকে দূর করতে পারলেই অপরের দোষ চর্চার এই মারাত্মক রোগেট প্রতিকার হতে পারে।

নিম্নে ইমাম গাযালী (র),সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র) ও সাইয়েদ আবদুল আলা মাওদূদী (র) প্রমূখ প্রসিদ্ধ বই ‘গীবত’ থেকে এর কারণসমূহ সংকলিত করা হলো ;

তাদের মতে গীবত চর্চার কারণসমূহের মধ্যে আটটি কারণ সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তিনটি কারণ উচ্চপর্যায়ের দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেগুলো হলো:

এক. ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মেটানোর জন্য একে অপরের দোষচর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

দুই.মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গিবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোনো বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে থাকলে, সে মনে করে আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গ দোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

তিন. পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে্ তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

চার. কোনো দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বলল, অমুকও এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

পাঁচ. অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের নিচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নেই। অর্থাৎ তার এ কথায় লক্ষ্য এই যে, সে-ই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

ছয়. প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। সে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদা বা ভালোবাসা লাভ করেছে তা যেন তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্য কিছু করতে না পারলেও সে তার গীবত চর্চায় মেতে উঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া ত্যাগ করে।

সাত. হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক বা ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

আট. অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-জ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরো যে তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে তার মধ্যে বাহ্যত কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শয়তান এর সাথে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়।

বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই সাধারণত এই তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে;

- কোনো দ্বীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোনো ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এ কথা বলা যে, এই লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নামোল্লেখ করে এরূপ কথা বলা হলে তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু করলে তাতে গীবত হবে না।

- কোনো দ্বীনদার ব্যক্তির ভুল- ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তিকে কোনো সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেলো বা শোনা গেলো। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুন গোসা বা অভিমান এর উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে গোসা বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়।,নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে উত্তম গ্রন্থ হলো, অপরের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্ত তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতে উভয়ে গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

গীবত ও চোগলখোরি কী এক?

ইসলামের নৈতিক বিধানে গীবত (ghibah) ও চোগলখোরি (namīmah)—উভয়ই জবান ও সামাজিক আচরণসংক্রান্ত গুরুতর গুনাহ। তবে এই দুই অপরাধকে এক মনে করা ভুল; কারণ শরীয়ত তাদের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং প্রভাব—সবকিছুর ভিত্তিতেই আলাদা করে ব্যাখ্যা করেছে।

গীবত বলতে বুঝায়—কারো অনুপস্থিতিতে এমন ত্রুটি বা দুর্বলতা উল্লেখ করা, যা বাস্তবে তার মধ্যে বিদ্যমান এবং যা সে শুনলে কষ্ট পাবে। অর্থাৎ গীবতের ভিত্তি হলো সত্য কথা হলেও সেটা অপছন্দনীয়, মানহানিকর ও চরিত্রহানিকর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, **"তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা তার মধ্যে আছে, আর যা সে অপছন্দ করবে—এটাই গীবত।"**
(সহিহ মুসলিম)

অন্যদিকে, আরেকটি গুনাহের নাম চোগলখুরি। এটি গীবত থেকেও জঘন্য গুনাহ। আরবি ভাষায় এর নাম نميمة নামীমাহ। অনুবাদ করলে এর নাম হয়, চোগলখুরি।

অর্থাৎ অপরের দোষ এজন্য বর্ণনা করা যেন শ্রোতা তার ক্ষতি করে। ক্ষতি যদি হয়েই যায় তাহলে বর্ণনাকারী বেশ খুশি হয় যে, বেশ ভালো হয়েছে, তার কষ্ট হয়েছে। বর্ণনাকৃত দোষটি বাস্তবেই ওই ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যাক বা না যাক; শ্রবণকারী যেন কষ্ট দেয় এটাই উদ্দেশ্য। এরই নাম নামীমাহ তথা চোগলখুরি।

কোরআন ও হাদিসে চোগলখুরির অনেক নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক। কারণ গীবতের মধ্যে খারাপ নিয়ত থাকে না। যার দোষ চর্চা করা হয় তার অনিষ্ট সাধনের নিয়ত থাকে না।

পক্ষান্তরে চোগলখোরের মাঝে খারাপ নিয়ত থাকে। যার দোষ চর্চা করা হচ্ছে তার ক্ষতিসাধনের নিয়ত থাকে। সুতরাং এটি দুটি গুনাহের সমষ্টি। একটি হলো, গীবত। দ্বিতীয়টি হল, মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেওয়ার নিয়ত।

তাই কোরআন-হাদীসে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কঠোরবাণী এসেছে।
কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

"هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

(কাফেরদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে) ওই ব্যক্তির মত চলে যে অন্যকে তিরস্কার করে, খোঁটা দেয় এবং একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগায়। হাদীস শরীফে এসেছে।

নবীজি সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يدْخل الْجنَّة قَتَّات

"চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না"।
(বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদাব)

কুরআনে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।
(সূরা হুজুরাত ৪৯:১২);

আর চোগলখোরিকে সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার প্রধান কারণ বলা হয়েছে।
(সূরা কলম ৬৮:১০–১১)।

রাসূল (স:)–এর বহু বাণীতে দু'টি অপরাধকে আলাদা শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে, যা স্পষ্ট করে যে—গীবত এবং চোগলখোরি এক নয়, বরং প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যে ভিন্ন গুনাহ।

অতএব, উভয় গুনাহ সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হলেও—গীবত ব্যক্তির সম্মান আঘাত করে, আর চোগলখোরি সমাজের শৃঙ্খলা ও সম্পর্কের ভিত্তি ধ্বংস করে।

ফলে বলা যায়, গীবত ও চোগলখোরি এক নয়—বরং দুটি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন মাত্রার গুনাহ, যদিও উভয়ের ক্ষতি ভয়াবহ এবং সমাজবিধ্বংসী।

গীবত থেকে বাঁচবো কী করে

গীবত থেকে বাঁচার উপায় হল, এর মারাত্মক পরিণতি ও শাস্তির কথা হৃদয়ে বসাতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনে কখনো গীবত করব না। অতঃপর বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে, 'হে আল্লাহ! গীবত নামক জঘন্য গুনাহাটি থেকে আমি পরিত্রান চাই। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গল্প করার সময় গীবত লিপ্ত হয়ে পড়ি; হে আল্লাহ! আমি শপথ করছি, ভবিষ্যতে কখনো গীবত করব না। কিন্তু আমার এই শপথ ঠিক রাখা এবং এর উপর বদ্ধপরিকর থাকা তোমার সাহায্য ও তৌফিক ছাড়া সম্ভব নয়। হে আল্লাহ! দয়া করে আমাকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার সাহস, উৎসাহ ও তৌফিক দান করো। আজই সাহস করে এভাবে শপথ ও দোয়া শুরু করুন।

গীবতের বৈধ পন্থাসমূহ

গীবত সাধারণত হারাম এবং মুসলিম জীবনে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ ও নৈতিক ব্যাধি হিসেবে বিবেচিত। যদিও অধিকাংশ সময় গীবত অপরাধমূলক ও সামাজিক ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবুও ইসলামী আইন ও আলেমদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট শর্তে গীবতকে বৈধ (permissible) ধরা যেতে পারে।

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। প্রতিটি জিনিসের স্বভাব বা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলাম বিধান প্রণয়ন করেছে। মানুষের স্বভাব ও চাহিদার প্রতিও ইসলাম লক্ষ রেখেছে। সেই অনুযায়ী বিধান প্রদান করেছে। এরই পেক্ষিতে ইসলাম কয়েকটি বিষয়কে গীবতের আওতাভুক্ত রেখেছে। যদিও বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে গীবত মনে হবে অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো গীবত নয়।

এই ধারাবাহিকতায় কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে গীবতকে বৈধ বা অনুমোদিত মনে করা হয়, যদি তা সত্য, ন্যায়সংগত এবং সামাজিক বা নৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়।

ইসলামিক নৈতিকতা ও শাস্ত্র অনুযায়ী, মানুষের আচরণ ও সম্পর্কের প্রতি সচেতন হওয়া অপরিহার্য। গীবতের বৈধ ব্যবহার মূলত সীমিত এবং উদ্দেশ্যনির্ভর। এটি অন্যের ক্ষতি নয়, বরং সৎ উদ্দেশ্য ও সামাজিক বা নৈতিক সুস্থতা রক্ষার জন্য করা হয়।

এই "বৈধ গীবত" ধারণাটি ইসলামের ফিকহ, আখলাক ও শাস্ত্রে গভীর ভিত্তি রাখে। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অপমান বা নিন্দার জন্য নয়, বরং একটি আড়ভুক্ত মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে—যেমন দোষ সামাজিক কর্তৃপক্ষকে জানানো, অন্যকে সতর্ক করা, নির্দিষ্ট কাজ বন্ধ করার জন্য বা জনসাধারণকে বিপদ থেকে অবগত করার জন্য। গীবতের এই অনুমোদন কখনই অবাধ বা অযাচিত কথা বলার সুযোগ দেয় না; বরং বেশ কিছু স্পষ্ট শর্ত ও সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে শাস্ত্র অনুযায়ী।

গীবতের জায়েজ পন্থা নিয়ে অনেক তাবেঈ, শায়েখ, আলেম ও মুফতিয়ানে কেরাম বেশ কয়েকটি পন্থা আলোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ ছয়টি কেউ আটটি এবং সর্বোচ্চ তেরোটি পন্থাকে গীবতের জন্য বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম গাযালী (র), সাফূরী (র), আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (র)সহ প্রমুখ বিভিন্ন গ্রন্থে গীবতের বিভিন্ন বৈধ পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তন্মেধ্যে এসব গ্রন্থকে বিবেচনা করে গীবতের বহুল আলোচিত বৈধ পন্থাবলী নিয়ে আলোচনা করা হলো:

এক- কারো প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে গীবত বৈধ

মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা ইসলামে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অধিকার। কারো জীবন রক্ষার স্বার্থে গীবত করা শুধুমাত্র বৈধই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কারণ, ক্ষতি প্রতিরোধ করা ইসলামী শরিয়তের সর্বজনীন নীতি—
“দর্‌উল-মাফাসিদ মুকাদ্দাম ‘আলা জালবিল-মাসালিহ” (ক্ষতি প্রতিরোধ করা উপকার আনার চেয়ে অধিক জরুরি)।

কারো ওপর কোনো ধরনের আক্রমণ আসতে পারে এমন অবস্থায় অপরের দোষ বর্ণনার প্রয়োজন পড়তে পারে। যেমন যখন কেউ দেখল যে, তার কাছের কেউ অপর ব্যক্তির খুন বা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে; এমন অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলে দিতে হবে যে তার প্রাননাশের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে ওই ব্যক্তি নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ পাবে। তো সেজন্য এই বিশেষ ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ হতে পারে।

কোরআন থেকে প্রমাণ
আল্লাহ বলেন:
“যারা অত্যাচারের শিকার তাদের পক্ষ থেকে উচ্চস্বরে কথা বলা ব্যতীত কারো কথার প্রকাশ আল্লাহ পছন্দ করেন না।”
(সূরা আন-নিসা ৪:১৪৮)

এই আয়াত থেকে আলেমরা বলেন: যেখানে কারো ওপর জুলুম হচ্ছে বা ক্ষতির আশঙ্কা আছে, সেখানে সত্য কথা প্রকাশ করা বৈধ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর—জালিম হলে তাকে জুলুম থেকে বিরত রেখে, আর মজলুম হলে তার অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস ৬৯৫২)

এখান থেকে বোঝা যায় যে,কারো ওপর জুলুম বা ক্ষতি হতে যাচ্ছে—এটা জানলে অন্যদের জানানো বৈধ, যাতে তাকে রক্ষা করা যায়।

ইমাম নববী "রিয়াজুস সালিহিন"-এ উল্লেখ করেছেন:

কারো ওপর মহান ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার অপকর্ম প্রকাশ করা গীবতের মধ্যে পড়ে না; এটি বৈধ এবং কখনো কখনো বাধ্যতামূলক।
(ইমাম নববী, আল–আযকার, অধ্যায়: আল-গীবাহ)

সুতরাং, কারো প্রাণ, সম্পদ বা সম্মানের ওপর বিপদের আশঙ্কা থাকলে সতর্ক করতে গিয়ে গীবত করা বৈধ।

দুই- দোষ বা পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা যাবে

কোনো ব্যক্তি কোনো দোষের কাজে বা পাপাচারে লিপ্ত থাকলে সেই সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে অবহিত করা গীবত হবে না, যে তাকে বারণ করতে পারবে, উপদেশ দিতে পারবে এবং তার উপর প্রভাব খাটিয়ে তার সংশোধন করতে পারবে। কারণ এই ধরনের গীবতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপকার হয়। ইহ্য়া উলূমিদ-দীন, সীরাতে আহমাদিয়া, তানবীরুল আবসার সহ প্রমূখ গ্রন্থে গীবতের এই পন্থাকে বৈধ হিসেবে অভিমত করা হয়েছে।

কুফার গভর্নর হযরত সাদ (রাঃ) -র বিরুদ্ধে অনেক ব্যাপারে জনগণ খলিফা হযরত উমর (রাঃ) -র নিকট নালিশ করলো। তার মধ্যে একটি অভিযোগ এই ছিলো যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়েন না এবং নামাযের কিরআত ঠিকমতো পড়েন না। খলিফা তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করে হযরত আম্মার (রাঃ)-কে তার স্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন। (বুখারী,বাব কিরআতিল ইমাম ওয়াল-মামুম)

উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা গেলো যে, মানুষকে দোষ - ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা বৈধ। তা না হলে হযরত উমর (রাঃ) নালিশ শুনতে প্রস্তুত হতেন না। কারণ গীবত শোনাও গীবত করার সমতুল্য।

তিন- কারো অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে গীবত বৈধ হবে

সমাজ -পরিবার কিংবা অফিসের কোনো খারাপ ব্যক্তি- যার দ্বারা কেউ বা কোনো কাজে বাধাগ্রস্ত হতে পারে ; এমন স্বভাবের ব্যক্তির ব্যাপারে ব্যক্তির অবর্তমানে অন্যদের নিকট তার খারাপ দিক নিয়ে সতর্ক করতে গিয়ে যে গীবত হয় বা হবে,তা জায়েজ।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন–
একদিনের ঘটনা আমি নবীজীর খেদমতে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে,সামনে থেকে এক লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।রাস্তায় থাকাকালীন নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বললেন, লোকটি তার গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, এ-কথা শুনে আমি একটু সতর্ক হয়ে বসলাম ; কারণ দুষ্ট লোক থেকে সতর্ক থাকা উচিত। তারপর লোকটি যখন

মসজিদে এসে বসলো, নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে স্বভাব অনুযায়ী সদাচরণ করলেন।

লোকটা চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন – ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার ভাষ্যমতে লোকটি গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, অথচ সে আপনার মজলিসে বসল আর আপনি তার সঙ্গে এত সুন্দর আচরণ করলেন ; এর কারণ কী?

নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : দেখো, লোকটি আসলেই ভয়ংকর, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা তার স্বভাব। মানুষ তার থেকে পালিয়ে বাঁচে। তার সঙ্গে যদি সুন্দর ব্যবহার করা না হয়, তাহলে সে এসে অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি তার সঙ্গে অভ্যাস মাপিক সুন্দর ব্যবহার করলাম।

হাদিসটির ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রা) আনহা-কে যে বললেন, 'লোকটি গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি'-- সাধারণ দৃষ্টিতে এটি একটি গীবত হয়েছে।

আবার মন্তব্যটি তার অনুপস্থিতিতে হয়েছে, কিন্তু তবুও এটা জায়েজ। কারণ এর দ্বারা নবীজির উদ্দেশ্য ছিলো লোকটির অনিষ্ঠতা থেকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সতর্ক করা: যেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা লোকটির কোনা ফ্যাসাদের শিকার না হন।

সুতরাং এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কেউ সত্যিকারের ক্ষতিকারক ব্যক্তি হলে,তার ব্যাপারে গীবত করলে; তা জায়েজ হবে।

চার- জালিমের জুলুমের আলোচনা গীবত নয়

কোনো ব্যক্তি বিচারক, মুফতী, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা পদস্থ কোনো কর্মকর্তার জুলুমের শিকার হলে সে রাজ-দরবারে তার প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারবে। কারণ রাজ-দরবারে জালেমের গীবত না করলে সে প্রতিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

উপরুক্ত নালিশের কারণে শাসনকর্তা জালেম কর্মকর্তাকে অপসারণ করে তদস্থলে ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন এবং ফলে নিরীহ লোকেরা জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাবে। অতএব এই উপকারিতার কারণে উপরোক্ত প্রকারের গীবত বৈধ।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ

“মানুষ খারাপ ব্যাপারটি বলুক তা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র”।
(সূরা নিসা:১৪৮)

শোআা (র) বলেন, জালেমের বিরুদ্ধে নালিশ করা অথবা কোনো পাপাচারের সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার গীবত করা বৈধ, বরং জালেম ও পাপাচারের সংস্পর্শ থেকে লোকদের দূরে রাখার জন্য তাদের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা গিবত নয়। (বায়হাকীর বরাতে আদ-দূররুল মানছুর)

আল্লাহ তায়ালার এ বাণী থেকে বুঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কোনো পাপের কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশকারীকে শাস্তি দিবেন। যদিও কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর ব্যক্তির বদদোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যে ব্যক্তি জুলুমের শিকার হয়েছে সে জালিমকে বদদোয়া করলে তা বৈধ হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি কতক লোকের মেহমাহ হতে চাইলে তারা তাকে মেহমান হিসেবে স্বাগত জানায়নি। ফলে সে প্রকাশ্যে তাদের বদনাম করলো। তার এই আচরণে সাহাবায়ে কেরাম (রা) অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ক্ষেপে গেলেন। তখন উপরোক্তা আয়াত নাযিল এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে গীবত করার অনুমতি দান করেন।

এই ঘটনা মুসনাদে আব্দুল রাজ্জাকী মসজিদ এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

হাজরামাওতের এক ব্যক্তি কিন্দা গোত্রের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে যে এই মর্মে অভিযোগ করলো যে, শেষোক্ত ব্যক্তির পিতা প্রথমোক্ত ব্যক্তির এক খন্ড জমি দখলদার করে নিয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন। (আবু দাউদ)

পাঁচ - লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে গীবত করা জায়েজ

কোনো ব্যক্তি কোন দোষের কাজে লিপ্ত থাকলে এই উদ্দেশ্যে তার গীবত করা বৈধ যে, তার দোষের কথা অপর ব্যক্তি জেনে ফেলেছে এই কথা জানতে পেরে সে লজ্জিত হয়ে দোষের কাজ পরিহার করবে।

একদা এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নালিশ করলো। তিনি তাকে ধৈর্য ধারনের নির্দেশ দিলেন। পুনরায় সে নালিশ করলে এবারও তিনি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। তৃতীয়বার সে তার প্রতিবেশীর গীবত করলে; তিনি বলেন, তোমার ঘরের জিনিসপত্র বাইরে রাস্তায় ফেলে দাও। তোমার প্রতিবেশী তা দেখে লজ্জিত হয়ে তোমাকে কষ্ট দেওয়া ত্যাগ করবে। সত্যিই সে মহানবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামতো নিজের ঘরের জিনিস-পত্র রাস্তায় ফেলে দিলো। লোকেরা রাস্তা অতিক্রমকালে তাকে মালপত্র নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রতিবেশীর কানে এ খবর পৌঁছালে সে লজ্জিত হয় এবং প্রতিবেশীর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

তবে কাউকে হেয়-প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে, যদি লজ্জা দিয়ে কারো গীবত করা হয়; তবে তা হারাম। ইসলামের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, এখানে সমাধানের জন্য শরীয়াহ ছেড়ে দেবে, কিন্তু কারো সম্মান কিংবা মানহানির উদ্দেশ্যে কোনো অরাজকতা, সমালোচনা, বা গীবতের জন্য ইসলাম কাউকে ছাড় দিবে না। এটাই ইসলাম, আর এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।

ছয়- নির্লজ্জ ব্যক্তির গীবত করা বৈধ

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে কোনো পাপ বা গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকে, অন্য কেউ তাকে সতর্ক করলে বা তাকে লজ্জা দিয়ে উক্ত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাইলেও সে সংশোধন হয় না – এমন ব্যক্তির গীবত বৈধ হবে।

এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়নমনি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের গীবত করতেন। কারণ, তারা ছিলো নির্লজ্জ, তারা নিজেদের দোষকে পরিপক্ক বুদ্ধির কাজ মনে করতো। গীবতের এই পন্থাকে বেশিরভাগ গ্রন্থে অনুমোদন করা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে –

'যে ব্যক্তি লজ্জার আবরণ ছিন্ন করলো তার দোষ চর্চা গীবত নয়'।
(সহীহ বুখারী:৩৭৫৩)

শেখ সাদী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত বৈধ।

*বেহায়া, *স্বৈরাচারী শাসক ও *যার গোপন পাপাচার অন্যদের ক্ষতির কারণ হয়।

ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত লাভের পর ইরাকের এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট জিজ্ঞেস করলো, 'পরিধানরত গায়ের কাপড়ে মশা-মাছির রক্তের দাগ লাগলে কি নামায হবে?

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করে বললেন, 'আল্লাহু আকবার, এ ইরাকারী এতটা খোদাভীরু হয়ে গেছে যে, মশা-মাছির রক্ত নিয়েও সতর্কতা অবলম্বন করে। অথচ এরাই ইমাম হুসাইনকে হত্যা করে তার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'হাসান ও হুসাইন এই পৃথিবীতে - আমার দুটি ফুল।

সাত- ফতোয়া জানার উদ্দেশ্যে গীবত হলে তা বৈধ

কোনো আলেম বা মুক্তির নিকট মাসায়ালা জানার উদ্দেশ্যে তার প্লট তৈরি করার জন্য কোনো ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করলে তাতে কোনো দোষ নেই।

যেমন: কোনো ব্যক্তি কোনো আলেমের নিকট গিয়ে বললো যে, আমার পিতা বা আমার ভাই বা আমার স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি এই অন্যায় আচরণ করেছে। তার কি এমন করার কোনো অধিকার রয়েছে? (এমন করার যদি অধিকার না থাকে) তবে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার ও নিজ অধিকারের অর্জনের উপায় কি?

অথবা কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, তার পিতা মারা গিয়েছে এবং তার পিতার নিযুক্ত ওসি তাকে ঠিকমত খরচপাতি দিচ্ছে না। এই অবস্থায় আমাকে ফতোয়া দান করুন।

একদিন উদবা বিন রবীয়ার কন্যা হিন্দা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন – হে আল্লাহর রাসূল, (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান খুব কৃপণ ব্যক্তি এবং তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ ঠিকমতো দেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তুমি তার অজান্তে তার মাল থেকে তোমার প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ নিয়ে নাও। (সহীহ বুখারী,কিতাবুন নাফাকা)

উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদিস অনুসারে গীবতের এই পন্থাকে জায়েজ করেছেন। এখানে হিন্দার, তার স্বামীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাটা গীবত হলেও তার উদ্দেশ্য ছিল সমাধান কিংবা মাসায়ালা জানা

আর তাই কোনো আলেম বা মুফতীর নিকট কোনো মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে গীবত করলে তা জায়েজ হবে।

আট- দুঃখ ও আক্ষেপের আকারে গীবত করা বৈধ

বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যেমন; সিরাতে আহমদিয়া, খিযানাতুর রিওয়ায়াত, রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি সহ প্রমুখ গ্রন্থে এই প্রকারের গীবত অনুমোদন করা হয়েছে। যেমন

আফসোস করা! হায় অমুক ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, যাকাত দেয় না। কারো কোনো খারাপ কাজে আক্ষেপ করা উত্তম।

কোনো মুসলমানকে শয়তানের নিকট পরাজিত হয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখে তার অবস্থার প্রতি করুণা করা উচিত। কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন, কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি চর্চা করে তাকে অপমানিত করার উদ্দেশে তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে, তবে আফসোস প্রকাশ করা হলে তা গীবত হবে না।

নয়- দৈহিক ত্রুটির পরিচয় দেওয়া

কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হলে এবং তাতে তার কোন দোষের প্রতি ইঙ্গিত থাকলে তাকে সেই উপাধিতে স্মরণ করায় কোনো দোষ নাই।

যেমন: রাতকানা, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, ট্যারা ইত্যাদি– এভাবে কারো পরিচয় দেওয়া বৈধ। কারণ ওই উপাধিতে তার পরিচয় না দিলে লোকেরা তাকে চিনতে পারবে না। যেমন এক ব্যক্তি আরাজ বা বিকলাঙ্গ উপাধিতে পরিচিত।। মুহাদ্দিসগণ এই উপাধীর একজন রাবীর হাদিস উক্ত উপাধিসহ বর্ণনা করেছেন।
তবে কাউকে ছোট করা বা অসম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। তবে যতটুকু পারা যায়, যতটা সম্ভব উক্তরূপ উপাধিতে স্মরণ পরিহার করাই উত্তম।

দশ- কোনো ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে গীবত করা বৈধ

কাউকে হেয় করা বা অপমান করার উদ্দেশ্যে পিছনে তার দোষ বলা গীবত এবং তা হারাম। তবে যদি কোনো ব্যক্তির নাম, পরিচয় বা এমন কোনো ইঙ্গিত না দেওয়া হয় যাতে তাকে চেনা যায়, তাহলে সেই বক্তব্য গীবত হিসেবে গণ্য হয় না। কারণ এ ক্ষেত্রে কথা বলার উদ্দেশ্য হয় ঘটনার বর্ণনা, শিক্ষা দেওয়া বা কাউকে ক্ষতি থেকে সতর্ক করা, ব্যক্তিকে হেয় করা নয়।

ইসলামী নীতিতে গীবতের মূল নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করা। আর যখন নামোল্লেখ বা পরিচয় স্পষ্ট হয় না, তখন কোনো ব্যক্তির সম্মানহানিও ঘটে না। ফলে নীতিগতভাবে

এমন আলোচনা বৈধ থাকে, যতক্ষণ না তা কারো প্রতি বিদ্বেষ, উপহাস বা অপমানের উদ্দেশ্যে বলা হয়।

এগারো- দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রাবীদের বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদীতা সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কোনো রাবী সম্পর্কে বলেছেন, সে ডাহা মিথ্যাবাদী, তার স্মরণশক্তি দুর্বল, সে মনগড়া হাদিস বর্ণনা করে, সে প্রত্যাখ্যাত(মুনকার) রাবী। অতএব এজন্য তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুরূপভাবে ফকিহগণ কোন কোন গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তার রচনাকারী ফকির নন অথবা অমুক গ্রন্থের রচয়িতা মুতাযিলা, তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় অথবা অমুক ব্যক্তি তার গ্রন্থের দুর্বল মাসাআলাও বর্ণনা করেছেন অথবা অমুক ব্যক্তি তার কিতাবে মনগড়া রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করে নিজের গ্রন্থকে অনির্ভরযোগ্য করেছেন।

বারো- সংশোধনের উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ হবে

কেউ কোন দোষ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এমন ব্যক্তির নিকট তার গীবত বৈধ ; যে ব্যক্তি তাকে উপদেশ দিলে বা ভয় দেখিয়ে কিংবা জোর খাটিয়ে সে গর্হীত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে।এতে দোষের কিছু নেই; বরং যার গিবত করা হয় তারই মূলত উপকার হয় ।

তাই কোনো আলেম মুফতী বা শায়েখের নিকট যদি এই উদ্দেশ্যে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হয় যে, তারা উক্ত ব্যক্তিকে উপদেশ দিবে যার কারণে সেই ব্যক্তি সংশোধন হয়ে যাবে। আর তাই এজন্য গীবতের এই পন্থাটা বৈধ।

সাহাবায়ে কেরাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে লোকদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন কিন্তু তার দ্বারা মুসলমানদের অপমান করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নসিহত করবে, ফলে উক্ত ব্যক্তি সংশোধন হয়ে যাবে।

একদা গভর্নর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'এখানে আবু জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে'।মূলত তার এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ছিল, যেন উক্ত ব্যক্তিকে সংশোধন সরূপ করে একটি পত্র পাঠানো হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে, সূরা মূমীনের ১-৪ আয়াত একটি পত্রে লিখে পাঠানো হয় এবং আবু জানদাল আয়াত পড়ে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং মদ্যপান পরিহার করে তওবা করেন।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে বোঝা গেল,দোষ-ক্রটি মুক্ত করার জন্যে কারো গীবত করলে তা বৈধ হবে।

তেরো- মানুষের পাপাচার এবং তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে গীবত বৈধ

এক ব্যক্তির দ্বারা অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সে অবহিত নয় যে, তার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ, যাতে সে অন্য লোকেদের ক্ষতির কারণ না হয়।

এমনকি কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির শাস্তির কথা উল্লেখ করে কাউকে সতর্ক করা জায়েজ। যেমন অমুক ব্যক্তি জাহান্নামের উপযোগী কারন সে নিয়মিত ব্যভিচারে লিপ্ত। এখানে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদের জেনা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা।

আবার কোনো ব্যক্তি গোপনে পাপাচারে লিপ্ত আছে এবং কোনো আলিম ব্যক্তি তার সাথে ওঠাবসা করছে। এই অবস্থায় তার সাথে ওঠাবসা করার কারণে হয়তো কখনো ঐই আলেম ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং লোকদের সতর্ক করার জন্য তার দোষক্রটি প্রকাশ করে দেওয়া বৈধ।

তবে মনে রাখতে হবে কোনো ব্যক্তি গোপনে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এবং তার দ্বারা অপরের কোনো ক্ষতি না হলে উক্ত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ নয়। এ জাতীয় দোষ ক্রটি প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তাআলাও মানুষকে সামনে দোষ প্রকাশকারীকে অপমান করবেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন;

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে আল্লাহ তায়ালাও কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। অনুরূপ যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, আল্লাহ তায়ালাও তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন, এমনকি তার ঘরেও তার দোষ চর্চা হতে থাকবে"।

অতএব কাউকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে গীবত জায়েজ, তবে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নয় অন্যথায় তা গীবত বলে গণ্য হবে।

এছাড়াও এ নিয়ে আরে মতবাদ রয়েছে। যেমন:

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী (র) বলেন,গীবত চার প্রকার :

(১) এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তাকে বললো, গীবত করো না। সে বললো, এটা গীবত নয়, আমি তার যথার্থ দোষ ত্রুটি বর্ণনা করছি। এই অবস্থায় গীবতকারী কাফের হয়ে যায়। কারণ হারামকে হালাল করা কুফর।

(২) কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে এমন ভাষায় তার গীবত করলো যাতে শ্রোতারা বুঝে ফেললো যে, সে কার গীবত করেছে। এই পন্থায় গীবতকারী মুনাফিক। কারণ বাহ্যত সে গীবত পরিহার করলেও মূলত সে গীবতে লিপ্ত রয়েছে।

(৩) কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামোল্লেখ করে তার গীবত করলোএবং সে জানে যে, গীবত করা খারাপ। এই অবস্থায় সে গুনাহগার হবে।

(৪) কোনো পাপাচারী ফাসেকের গীবত করা সওয়াবের কাজ। কারণ লোকেরা ফাসেকের এই বদনামি শুনে তার সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে।

মতান্তরে গ্রন্থকার বলেন, ফাসেক ব্যক্তির গীবত করা **দুইটি** কারণে বৈধ ;

(১) সে লোকমুখে তার দুর্নামের কথা শুনতে পেয়ে লজ্জিত হয়ে হয়তো পাপাচার থেকে বিরত হবে। যে ব্যক্তি ফাসেক তাকে সালাম করা মাপরূহ।

(২) আল্লাহর দৃষ্টিতে ফাসেকের কোনো মর্যাদা নেই।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"যখন পাপাচারী ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন মহান প্রভু অসন্তুষ্ট হন"।

সুফিয়ান ইবনে উরাইনা (র) বলেন, **তিন** ব্যক্তির গীবত করা বৈধ;

***১** জালিম শাসক
***২** প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি
***৩** বিদআতী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি যে অন্যদেরও বিদআত শেখায়।

হাসান বসরী (র)- ও অনুরূপ এ কথা বলেছেন।

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে কী পার্থক্য আছে?

মানুষের মাঝে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর মানসে একজনের কথা অন্য জনের নিকটে লাগানোকে চোগলখুরী বলে। চোগলখুরীর ফলে মানুষের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে।

এছাড়াও বলা যায়, চোগলখোরি হচ্ছে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তির দোষ অপর ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করা।

ইমাম নববী (রহ.) বর্ণনা করেন,
"ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য একের কথা অপরের নিকট পৌঁছানোকেই চোগলখোরি বলে।"

গীবতের মত চোগলখোরিও একটি মারাত্মক অপরাধ। যে ব্যক্তি ক্ষতিসাধন ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়ায় তাকে চোগলখোর বলে।

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দোষ বলে বেড়ানোকে গীবত বলে। আর দু'ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অপরজনের নিকট বলাকে চোগলখোরি বলে। অতএব যেখানে চোগলখোরি হয় সেখানে গীবতও রয়েছে।

চোগলখুরীর নিন্দায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٖ. [القلم: ١٠، ١١]

"যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অন্যের নিকটে লাগায় আপনি তার আনুগত্য করবেন না"।

[সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত: ১০-১১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ»

"চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না"।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন–

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মদীনার একটি খেজুর বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তথায় তিনি দু'জন লোকের আহাজারী শুনতে পেলেন। তখন তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»

"এ দু'জনকে 'আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো কারণে নয়। অবশ্য এগুলো কবীরা গুনাহ। তাদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত"।চোগলখুরীর একটি নিকৃষ্ট প্রক্রিয়া হলো, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরানো। অনুরূপভাবে অনেক কর্মজীবি অফিসের বস কিংবা দায়িত্বশীলের নিকট অন্য কোনো কর্মজীবির কথা তুলে ধরে। এতে তার উদ্দেশ্য উক্ত কর্মজীবির ক্ষতি সাধন করা এবং নিজেকে উক্ত দায়িত্বশীলের শুভার্থী বা খয়েরখাঁ হিসাবে তুলে ধরা। এসব কাজ চোগলখুরী হিসাবে গণ্য এবং তা হারাম।

গীবতের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ

কোরআন ও হাদিসে চোগলখুরির অনেক নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক। কারণ গীবতের মধ্যে খারাপ নিয়ত থাকে না। যার দোষ চর্চা করা হয় তার অনিষ্ট সাধনের নিয়ত থাকে না। পক্ষান্তরে চোগলখোরের মাঝে খারাপ নিয়ত থাকে। যার দোষ চর্চা করা হচ্ছে তার ক্ষতিসাধনের নিয়ত থাকে। সুতরাং এটি দুটি গুনাহের সমষ্টি। একটি হলো, গীবত। দ্বিতীয়টি হল, মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেওয়ার নিয়ত। তাই কোরআন-হাদীসে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কঠোরবাণী এসেছে।

কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

(কাফেরদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে) ওই ব্যক্তির মত চলে যে অন্যকে তিরস্কার করে, খোঁটা দেয় এবং একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগায়। হাদীস শরীফে এসেছে।

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يدْخل الْجنَّة قَتَّات

“চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না”।
(বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদাব)

গীবতের শাস্তি ও ভয়াবহতা

গীবত এমন একটি নৈতিক অপরাধ যা মানুষের সম্মানহানি ঘটায় এবং সমাজে বিভেদ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। ইসলামে এটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এর ফল ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

গীবতের কারণে হৃদয়ে হিংসা, বিদ্বেষ ও অবমাননার প্রবণতা জন্ম নেয়; মানুষের মধ্যে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে অশান্তি নেমে আসে।

কুরআন ও হাদীস গীবতের পরিণামকে অত্যন্ত ভয়াবহ হিসেবে চিত্রিত করেছে—এটি সওয়াব নষ্ট করে, গুনাহ বাড়ায় এবং আল্লাহর নিকট অপ্রীতিকর কর্ম হিসেবে গণ্য হয়।

(এক) গীবত ইসলামি শরিয়তে হারাম ও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'ধ্বংস তাদের জন্য, যারা অগ্র-পশ্চাতে দোষ বলে বেড়ায়।'
(সূরা হুমাজাহ-১)

(দুই) কেয়ামতের দিন নিজের মুখ নিজের নখ দ্বারা জখম করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

মিরাজের সময় আমাকে এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহ আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরীল আঃ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা নিজ ভাইদের গীবত করত ও ইজ্জতহানি করত।

অন্যত্র হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

''মি'রাজের রাতে আমি এমন একদল লোককে অতিক্রম করলাম যারা নিজেদের নখ দ্বারা নিজেদের মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বলেন, এসব লোক গীবত করতো এবং মানুষের ইজ্জত আব্রু নিয়ে টানাটানি করতো।

(তিন) গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।

হাদীস শরীফে গীবতকে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তিব্যভিচার করার পর খাঁটি তওবা করলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে তার গুনাহ গীবতকৃত ব্যক্তি মাফ নাকরা পর্যন্ত মাফ হয় না।

হাদীসটি হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হল,গীবতের মাধ্যমে আল্লহতায়ালার হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন)

(চার) কবরে আযাব হবে।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কবরের বাসিন্দাদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। মহানবী (সা.) বলেনঃ তারা দু'জন খুব মারাত্মক কোন গোনাহ করেনি, অথচ তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাদের একজন মানুষের গীবত করতো এবং অপরজন পেশাব করে উত্তমরূপে পবিত্র হত না।

অতপর তিনি গাছের দু'টি তাজা ডাল চেয়ে নিয়ে তা দু'ভাগ করে দু'জনের কবরের পাশে গেড়ে দেন এবং বলেন, ডাল দুটি যতক্ষণ তরতাজা থাকবে ততক্ষণ তাদের হাল্কা শাস্তি হবে। (ইবনে আবিদ দুনয়া)

(পাচঁ) কোন ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্ত করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা আল্লাহ তায়ালার মর্জি বিরোধী কাজ।

বরং যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো এবং অপরজন পাপাচারে লিপ্ত থাকতো। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সব সময় পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতো। একদিন সে চটে গিয়ে বলল, আল্লাহর শপথ! তুমি জাহান্নামে যাবে। কথাটি আল্লাহ্ পাকের অপছন্দ হলো এবং ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী এবং পাপীকে জান্নাতী বানিয়ে দিলেন (আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি (ওয়াস-মিলাহ)।

(ছয়) কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকুলের সামনে অপমানিত হবে।

মহানবী (সা.) বলেন, ‘‘কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তিকে অপমান করা হলো এবং উপস্থিত ব্যক্তি তাকে সাহায্য করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করল না, কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা তাকে সৃষ্টিকুলের সামনে অপমানিত করবেন।’’ (আহ্মেদ, তাবারানী)

গীবত না করার সুফলঃ

✔ যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করলো, আল্লাহতা’য়ালা কিয়ামতের দিন তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করবেন।

✔ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করল, তাকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া আল্লাহতা’য়ালার কর্তব্য হয়ে যায়।

✔ মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘কেউ খারাপ কাজ করে বসলো অথবা নিজের উপর জুলুম করলো, অত:পর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহ্কে ক্ষমাকারী ও দয়াকারী হিসাবেই পাবে।’’(সূরা নিসা : ১১০)

গীবতকারীর পার্থিব ক্ষতি

* গীবতকারীকে কেউ বিশ্বাস করে না, পছন্দ করে না, ভালবাসে না, মূল্যায়ন করে না এবং সবাই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

*পারবারে বড়রা গীবত করলে তা ছোটদের মাঝে সংক্রমিত হয় এবং বাচ্চাদের মাধ্রমে তা প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের বাচ্চাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

*প্রতিবেশী ও শিশুর বন্ধুমহলে পরনিন্দার কারণে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি ও শত্র“তার সৃষ্টি হয়। যার শেষ পরিনতিতে বড়দের মাঝে এসে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পপাস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। হিংসা-বিদ্বেষ বিরাজ করে।

* পরনিন্দার ফলে পরিবার ও সমাজে বিঃশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সমাজে অশান্তি বিরাজ করে।

* গীবত করা এক ধরণের রোগবিশেষঃ
হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, আল¬াহর জিকির করা রোগের ঔষধ স্বরূপ, গীবত করা রোগ বিশেষ। সুতরাং গীবত নামক রোগ হতে দূরে থাক।

*গীবতের ফলে বিপদ ও বালা-মুসিবত নাযিল হয়। নিন্দাকারী অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়।

*গীবতকারী মুনাফিক ও ফাসিক হয়।
এছাড়াও কোরআনে বলা হয়েছে, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। রাসুল (সঃ) বলেন- মুনাফিকের আলামত তিনটি ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে খেলাফ করে, ৩. আমানত রাখলে খেয়ানত করে।

*গীবতকারী বাঘের চেয়েও হিংস্র ও নিকৃষ্ট। কারন বাঘ আপন ভাইয়ের মাংশ খায় না, অথচ গীবতকারী আপন মৃত ভাইয়ের মাংশ ভক্ষনকারী।

*গীবত করা অসৎচরিত্রের প্রমান দেয়, পক্ষান্তরে গীবত ত্যাগকারী সৎচরিত্রের পরিচয় দেয়।

*গীবত ঈমানকে ন্যাড়া করে দেয়ঃ
রাসুল (সঃ) বলেন- গীবত ও চোগলখুরী ঈমানকে ছিলে ন্যাড়া করে দেয়।

*ইবাদত বেশী করার চেয়ে গীবত ত্যাগ করা উত্তম।

*রোজা অবস্থায় গীবত করলে রোজা মাকরুহ হয়ে যায়।

*গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না এবং আল্লাহর রহমত পায় না।

*গীবত ঈর্ষার জন্ম দেয়, আর ঈর্ষা পূণ্যকে খেয়ে ছাপ করে দেয়।
রাসুল (সঃ) বলেন, ঈর্ষা-হিংসা-বিদ্বেষ পূণ্যকে খেয়ে ছাপ করে দেয়, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ছাপ করে দেয়।

গীবতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

ইসলামের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি গিবত শোনে সেও গিবতের পাপের অংশীদার হয়ে যায়। তাই যেই আসরে গিবত হয়, সেই আসর বর্জন করা জরুরি। হাদিস শরিফে আছে, যখন কেউ আপনার সঙ্গে বসে অন্যের গিবত করে তখন তাকে থামতে বলুন, আল্লাহর হুকুমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করুন। আর তাতেও যদি কাজ না হয় তবে সেখান থেকে সরে আসুন। কোনোভাবেই গিবত শোনা যাবে না।

আল্লাহ বলছেন, 'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।'
(সুরা মায়েদা: ২)
নিচে গিবতকারীর জন্য কিছু করণীয় তুলে ধরা হলো যেগুলো আমল করলে গিবতের ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে;

১) তাওবা-ইস্তেগফার করা

কারো গিবত করে ফেললে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্তেগফার করা।
গুনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে ভর্ৎসনার মাধ্যমে সেই ইস্তেগফার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যেন এমন গুনাহ না হয় সেজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

এটি হলো গিবতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রথম পদক্ষেপ।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।'
(সুরা বাকারা: ১৬০)

২) যদি সম্ভব হয় ক্ষমা চেয়ে নেওয়া

যার গিবত করা হয়েছে যদি তার কাছে যাওয়ার সুযোগ থাকে; তাহলে তার কাছে গিয়ে তার হক নষ্ট করার কারণে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তবে যদি এতে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার

আশঙ্কা থাকে কিংবা আরও বেশি ভুল বুঝার আশঙ্কা থাকে তাহলে অনেক আলেমের মতে মাফ চাইতে না যাওয়াই উত্তম।

কিন্তু যেকোনো উপায়ে মাফ চেয়ে নেওয়াই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। কেননা গিবত করার মাধ্যমে বান্দার হক নষ্ট হয়। আর বান্দার হক নষ্ট করার কারণে কেয়ামতের ময়দানে আটকা পড়তে হবে।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করেছে সে যেন আজই মাফ চেয়ে নেয়, তার ভাইয়ের জন্য তার কাছ থেকে নেকি কর্তন করে নেওয়ার আগে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোনো দিনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকি না থাকে তবে তার (মজলুম) ভাইয়ের গুনাহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।' (বুখারি: ৬৫৩৪)

(৩) ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

হাদিসে এসেছে, কেউ যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্য অগোচরে দোয়া করে তাহলে তার জন্য ফেরেশতারাও দোয়া করেন।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যখন কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তার পশ্চাতে দোয়া করে, তখন তার (মাথার কাছে নিযুক্ত) একজন ফেরেশতা তাঁকে লক্ষ্য করে বলে, তোমার জন্যও এমনই হোক'।

(সহিহ মুসলিম: ২৭৩২)

সুতরাং যার গিবত করেছেন তার জন্য যদি দোয়া করেন আল্লাহর ফেরেশতারা আপনার গুনাহ মাফের জন্যও আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। তাছাড়া এমন দোয়াকে গিবতের কাফফারা বলা হয়েছে হাদিসে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, গিবতের কাফফারা হলো তুমি যার গিবত করেছ, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি এভাবে বলবে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।' (বায়হাকি)।

যদিও হাদিসটিকে জয়িফ বলেছেন আলেমরা, তবুও এই হাদিসের ওপর আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা অন্যান্য হাদিসের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক নয়।

(৪) মজলিস শেষ করে দোয়া পাঠ করা

যেই মজলিসে গিবত করা হয়েছে সেই মজলিস থেকে উঠার সময় বিশেষ দোয়া পাঠ করা। এতে করে হাদিস অনুযায়ী, মজলিসের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

দোয়াটি হলো—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

‘সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।’ অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।’

(তিরমিজি: ৩৪৩৩)

সুতরাং দোয়াটি পাঠ করার মাধ্যমে মজলিসের গুনাহ থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।

(৫) মজলিসে ওই ব্যক্তির প্রশংসা করা

মজলিসে যে ব্যক্তির গিবত করা হয়েছে তার কোনো প্রশংসা করা হলে সেটি গিবতের গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কারণ হতে পারে।

তাই ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম নববি (রহ)-এর মতো প্রসিদ্ধ আলেমদের পরামর্শ হলো— যেই মজলিসে গিবত করা হয়েছে ওই মজলিসেই একই ব্যক্তির গুণকীর্তন করা উচিত, যাতে গিবতের গুনাহের অনেকটা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

পবিত্র কোরআনে এসেছে, اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ‘নিশ্চয়ই ভালো কাজ খারাপ কাজের ক্ষতিপূরণ হয়’।

(সুরা হুদ: ১১৪)

কাজেই কারো গিবত হয়ে থাকলে তার গুণগুলোর উল্লেখ করাও উত্তম।

(৬) নিজ ভাষা নিয়ন্ত্রণে রাখা

মুখে যা আসবে তা-ই বললে চলবে না বরং প্রত্যেকটি কথা হিসাব করে যথাস্থানে ব্যবহার করতে হবে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের প্রতিটি কথাই রেকর্ড হয়ে থাকছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

:مَا يَلفظ من قول إِنَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ]ق

"সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই লিপিবদ্ধ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।

সাবধান থাকতে হবে যেন এই কথার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে না হয়।

রাসূল বলেন,

.مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়ালের ও দুই পায়ের মধ্যস্থিত বিষয়ের (জিহ্বা ও যৌনাঙ্গের) যামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব।" সুতরাং ভাষা ও যৌনাঙ্গকে সর্ব প্রকার ব্যভিচার থেকে হেফাযত করতে হবে।
অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

উকবাহ ইবনু আমের বলেন, আমি রাসূল এ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে নাজাত পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার জিহ্বা তথা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, নিজ বাড়িকে যথেষ্ট মনে করবে (বাড়িতে বেশী বেশী অবস্থান করবে) এবং তোমার গোনাহের কারণে বেশী বেশী ক্রন্দন করবে।"'
রাসূলুল্লাহ্ আরও বলেন,

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

"মানুষের জিহ্বার কর্মফলই মানুষকে তার মুখের ভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। "

(৭) আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় করা

প্রতিটি কথা ও কর্ম মহান আল্লাহর নিকট অতি নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে রেকর্ড হচ্ছে এবং এই রেকর্ডভুক্ত সকল আমল পরকালে মহান আল্লাহর দরবারে প্রকাশ করা হবে এবং এ ব্যাপারে জবাবদিহিও করা হবে।
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ووضع الكتاب فترى المُجْرِمِينَ مُشفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالَ هذا الكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغيرة ولا كبيرةُ وَصَواَاَجاْ إلاَ أَلا أَلاْمَ صَغيرة عَمِلُوا حاضرا ولا يَظْلِمُ رَبُّكَ أحدا]الكهف: ٤٩]।

"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে; অতঃপর এতে যা রয়েছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় অদৃশ্য জ্ঞানে উহা সঞ্চিত করে রেখেছেন। আমি প্রার্থনা করছি যে, কুরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তি ও বক্ষের জ্যোতি স্বরূপ করে দিন এবং আমার সকল দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দূর হওয়া ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অপসারণ হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন।

৮) সৎ সঙ্গী গ্রহণ নির্বাচণ করা

ভাল-মন্দ পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই তো বলা হয় 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। অতএব সঙ্গী যদি ভাল আচরণের হয় তাহলে সে গীবতের মত জঘন্য পাপ ও এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে সঙ্গীকে অবশ্যই রক্ষা করার চেষ্টা করবে।
এজন্যই রাসূল বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكَ إِمَّا أَنْ يُحْدِيْتِمَاْتِمَا أَنْ يُحْذِيَكَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيْثَةً.

"সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে (মিস্ক) আতর বহনকারীর ন্যায় আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে কামারশালার (হাফরের) ন্যায়। অতএব (মিস্ক) আতর বহনকারী হয়ত তোমাকে একটু আতর (লাগিয়ে) দিবে অথবা তুমি একটু খরিদ করে নেবে, তাও যদি না হয় তাহলে অন্ততঃ একটু সুগন্ধি লাভ করতে পারবে। আর কামারশালার অবস্থা হচ্ছে এমন যে, তাতে তোমার কাপড় পুড়ে যাবে অথবা তুমি ঐ আগুন ও কয়লার দুর্গন্ধ পাবে।"

(৯) হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন করা

অন্যের ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা দেখে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন করতে হবে। কেননা এর ফলে নেকি ও পুণ্য নষ্ট হয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেমে আসে। পক্ষান্তরে যার হিংসা করা হয় তার কোনই ক্ষতি হয় না। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।
আর এই পরশ্রীকাতরতা মহিলাদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

১০) মৃত্যুর ভয় ও স্মরণ করা

মৃত্যুর ভীষণ ব্যথাদায়ক যন্ত্রণা ও কবরের ভয়াবহ আযাবের প্রতি ঈমান রেখে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা গীবতের কারণেও মৃত্যুর শাস্তি কঠিন হবে।

(১১) পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা

বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবসে আসল সম্বল হবে নিজের সৎ আমল। অতএব এই সম্বল যেন কোন খারাপ আমলের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আর সৎ আমল নষ্ট করার অন্যতম উপায় হচ্ছে গীবত।

(১২) সালাফে সালেহীনের বাণী ও আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা

এ মর্মে বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে, তন্মধ্যে মাত্র দু'একটি উল্লেখ করা হল- যেমন- উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন, "তোমরা মানুষের সমালোচনা করা হতে সাবধান থাকবে। কেননা এটা হচ্ছে বড় মারাত্মক ব্যাধি। আর বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে। কেননা এটা হচ্ছে রোগ নিরাময়ক মহৌষধ। "

আলী ইবনুল হুসাইন জনৈক ব্যক্তিকে গীবতে লিপ্ত দেখে বলেন, "গীবতের বিষয়ে তুমি সাবধান থাকবে। কেননা এই গীবত হচ্ছে মানবরূপী কুকুরের তরকারী (খাদ্য)।"

আবু আছেম বলেন, "গীবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা আমি যখন জানতে পেরেছি তখন থেকে আর কখনই কারো গীবতে লিপ্ত হইনি"।'
অনুরূপভাবে মায়মুন ইবনে সিয়াহ্-এর অবস্থা দেখুন, "মায়মুন ইবনে সিয়াহ্ কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে অন্য কারো গীবত করারও সুযোগ কাউকে দিতেন না। তিনি গীবতকারীকে কঠিনভাবে প্রতিহত করতেন এবং বাধা না শুনলে উক্ত মজলিস ছেড়ে উঠে যেতেন।"২

জনৈক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রাহেমাহুল্লাহ্)-কে বলেন, "আপনি আমার গীবত করেছেন, জবাবে তিনি বলেন, আপনার মর্যাদা আমার নিকট ঐভাবে পৌঁছেনি যে, আমি আমার নেকিতে আপনাকে অংশীদার করব?" অর্থাৎ গীবত করলে নিজের পুণ্য দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে অতএব নিজের নেকি অন্য কাউকে দিতে চাই না।

ইবনুল মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, "আমি যদি কারো গীবতে লিপ্ত হতাম তাহলে আমার পিতা-মাতারই গীবত করতাম। কেননা তারা দু'জনই আমার নেকি পাওয়ার অধিক হকদার।"

(১৩) খালেছ অন্তরে তাওবা করা

গীবতের মত মহা পাপে লিপ্ত হয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পেতে অবশ্যই তাওবা করতে হবে। কৃত অন্যায়ের জন্য যেমন তাওবা করতে হয়। তেমনিভাবে ভাল আমল বেশী বেশী করতে না পারার কারণেও তাওবা করা দরকার। আর শুধু মুখে তাওবা-আস্তাগফিরুল্লাহ্ বললেই পরিপূর্ণ তাওবা হবে না; বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণিত শর্তাবলী পালনের মাধ্যমে তাওবা হতে হবে।

তাওবার কিছু শর্তাবলী

তাওবার জন্য উলামায়ে কেরাম কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্তারোপ করেছেন।
সেই শর্তাবলী পালন করা ব্যতীত মহান আল্লাহর নিকট তাওবা গৃহীত হওয়ার আশা করা যায় না। উল্লেখযোগ্য শর্তসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল:

১. গোনাহের কাজ বর্জন করা:

তাওবার প্রথম ধাপ হকো; যে গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়েছে তা থেকে নিজকে পুরোপুরিভাবে বিরত থাকা।
কারো যদি গুনাহ চলমান থাকে, আর সে শুধু মুখে তাওবা করে—তাওবা গ্রহণ হওয়ার শর্ত পূরণ হয় না।
গুনাহ বন্ধ করা মানে: কাজটি ছেড়ে দেওয়া, সেই কাজের দিকে আর অগ্রসর না হওয়া এবং গুনাহের পরিবেশ ও কারণ থেকেও দূরে থাকা।

২. অতীতের গুনাহের জন্য আন্তরিক অনুতাপ ও আত্মানুশোচনা করা:
তাওবার মূল ভিত্তি হলো আন্তরিক অনুতাপ।
অনুতাপ মানে গুনাহকে নিজের জীবনের কলঙ্ক মনে করা।এর প্রতি মনে গভীর কষ্ট অনুভব করা এবং আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য হৃদয় ভেঙে যাওয়া।
অনুশোচনা ব্যতীত কোনো ব্যক্তির তাওবা সঠিক রূপ লাভ করতে পারে না। যে ব্যক্তি তাওবা করে অথচ কৃত অন্যায়ের প্রতি অনুতপ্ত হয় না, তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে ঐ খারাপ ও গর্হিত কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে। কেননা হাদীসে এই অনুশোচনা ও অনুতপ্ত হওয়াকেই তাওবা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "**কৃতকর্মের প্রতি প্রকৃত অনুশোচনাই হচ্ছে তাওবা"**।'

উলামায়ে কেরাম বলেন, এই অনুতাপ ও অনুশোচনার লক্ষণ হচ্ছে, সর্বদা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা ও সেই অপরাধের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ না করা।

৩. ভবিষ্যতে আর গুনাহে না ফেরার দৃঢ় সংকল্প করা:

জীবনে যত বাধাই আসুক, যত যুলম-নির্যাতন হোক না কেন কোনক্রমেই অতীত পাপ কর্ম পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করা। তবে মুমিনের চরম শত্রু অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে যদি দ্বিতীয় বার সেই পাপে লিপ্ত

হয়েই যায়, তাহলে পরম করুণাময় মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে পুনরায় দৃঢ় সংকল্পের সাথে তাওবা করতে হবে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করতে পারেন।
হাদীসে কুদসীতে রাসূল বলেন, 'আল্লাহ বলেন, আমার কোন বান্দা গোনাহ করার পর যখন বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহ মাফ কর। তখন মহান আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দা গোনাহ করে কিন্তু এ বিশ্বাস রাখে যে, তার রব্ব (প্রতিপালক) আছেন, তিনি এই গোনাহ মাফ করেন আবার চাইলে এই গোনাহের কারণে পাকড়াও করেন। এভাবে সে পাপ করতে থাকে এবং তাওবাও করতে থাকে। তৃতীয় কিংবা চতুর্থবারে আল্লাহ বলেন, 'তোমার যা খুশী করতে থাক, আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি'।'

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করতে থাকবে, আমি ততক্ষণ মাফ করতে থাকব। এ হচ্ছে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের কথা।

অতি সতর্কতার সাথে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কোনক্রমেই যেন একই পাপ কার্য বার বার সংঘটিত না হয় এবং মনে এ আশাও যেন না থাকে যে, গোনাহ্ করতে থাকি পরে কোন এক সময় তাওবা করে নেব। কেননা পাপ করার পর তা থেকে তাওবা করার সুযোগ নাও মিলতে পারে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে এবং অসংখ্য নেয়ামতের আশায় বার বার গোনাহে লিপ্ত না হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন।
আল্লাহ পাক বলেন,
"তারা কখনও কখনও অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? (তিনি ব্যতীত ক্ষমা করার কেউ নেই) তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তা-ই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ, যেখানে তারা থাকবে অনন্ত কাল। যারা সৎ কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান"।

উপরোক্ত শর্তসমূহ একান্তই আল্লাহ ও বান্দার সাথে সম্পৃক্ত। তবে হক্কুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) নষ্টের কারণে তাওবার জন্য উক্ত শর্তসমূহের সাথে অন্য আরেকটি শর্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪. অন্যায়ভাবে নষ্টকৃত সম্পদ ও সম্মান মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া:

উলামায়ে কেরাম বলেন, অন্যের সম্পদ জবর-দখল কিংবা চুরি করে থাকলে বা যে কোন উপায়ে আত্মসাৎ করলে তা সেই মালিককে প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে হোক ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন ক্রমেই যদি প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করা সম্ভব না হয়, তাহলে সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ তার পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ করে দিবে এবং তার জন্য বেশী বেশী দু'আ করবে।

অপরাধ যদি এমন বিষয় হয় যা বাস্তবে ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়, যেমন গীবত করা কিংবা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অপপ্রচার করা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ফেৎনা সৃষ্টির ভয় না থাকলে সরাসরি তার নিকট বিষয়টি উল্লেখপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কেননা এটা বান্দার হক্ক। সুতরাং বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা করবেন না।"

তবে ফেৎনা সৃষ্টির ভয় থাকলে তাকে অবহিত না করেই সে ব্যক্তির অগোচরে তার জন্য অধিক পরিমাণে দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

যেসব স্থানে ঐ ব্যক্তির গীবত ও দোষচর্চা করা হয়েছে, সেসব স্থানে খালেছ অন্তরে সুনাম ও ভাল গুণাবলীর কথা আলোচনা করতে হবে, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাকে মাফ করতে পারেন। তবে অতি উত্তম হল এ ধরনের জঘণ্য পাপে লিপ্ত না হওয়া।

অনুরূপভাবে বান্দার ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদি অন্যায়ভাবে নষ্ট করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি ক্ষমা না করে।

রাসূলুল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ وَارَكَ دِرْهَم......

'যদি কোন ব্যক্তি অন্যের ইযযত নষ্ট কিংবা অন্য কিছু হরণ করে থাকে, তাহলে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই তা নিষ্পত্তি করে নেয়, যে দিন তার কোন দীনার-দিরহাম কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

কেননা সে দিন তার মাফ নেওয়ার কোনই উপায় থাকবে না'।'

৫. তাওবা করতে হবে মৃত্যুর আগে

মৃত্যুর মুহূর্তে আত্মা যখন গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় (গরগরা), তখন করা তাওবা আর গ্রহণ হয় না।
কারণ তখন আর মানুষ প্রকৃত অর্থে ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তাওবা করে না; বরং মৃত্যুর দৃশ্য দেখে বাধ্য হয়ে তাওবা করে।

শেষ কথা

গীবত কেবল কথার খেলা নয়; এটি মানুষের অন্তরের আঘাত, সম্পর্কের ভাঙন এবং সমাজের অশান্তির প্রতিফলন। আমাদের প্রতিটি শব্দের জন্য দায়বদ্ধতা রয়েছে; যা কখনও আহত করতে পারে, কখনও ভরিয়ে দিতে পারে বিশ্বাস ও শান্তি। সত্যের পথে, ন্যায়ের আলোতে এবং অন্যের সম্মান রক্ষার মানসিকতায় চলা প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা প্রভাবশালী করতে পারি।

যখন আমরা নিজেদের অন্তরের সততা রক্ষা করি, অন্যকে অনিষ্ট থেকে বাঁচাই এবং সৎ কথার মাধ্যমে সহানুভূতি ও সম্মান ছড়িয়ে দিই, তখন আমাদের জীবন ও সমাজ উভয়ই আলোকিত হয়। গীবত থেকে দূরে থাকা কেবল পাপ থেকে বিরত থাকা নয়; এটি হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার, সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার এবং সমাজকে মানবিক ও নৈতিক দিশা দেখানোর মহৎ প্রয়াস।

অন্তরের সততা, জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক দায়িত্ব পালন করা আমাদেরকে শুধু একজন ভালো মুসলিম বানায় না, বরং আমাদের চারপাশের মানুষদের জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। প্রতিটি মুহূর্তের ছোট ছোট সতর্কতা, সদিচ্ছা ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা সমাজকে একটি সুন্দর, মানবিক এবং ঈমানময় পরিবেশে রূপান্তরিত করে। গীবত থেকে দূরে থাকার এই সাধনা, সত্যিই আমাদের অন্তর ও সমাজকে আলোকিত করার এক চিরন্তন নীতি।

এমন নৈতিক সচেতনতা ও পরিশুদ্ধ জীবনই আমাদেরকে পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সৎ মানুষদের সাথে চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের পথ দেখায়। গীবত থেকে দূরে থাকার এই সাধনা কেবল পৃথিবীর জন্য নয়; এটি আমাদের আত্মাকে প্রস্তুত করে এমন এক পরকালীন জীবনযাত্রার জন্য, যেখানে সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতা চিরকাল অমলিন থাকে।